বিশ একুশ

মহাশ্বেতা দেবী

প্রমা

প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭

BISH EKUSH

A Bengali Novel by Mahasweta Devi

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৬৫

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

প্রকাশক :

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ

কলকাতা-১৭

মুদ্রাকর :

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী পান

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৩৭।১।২ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড

কলকাতা-৪

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ বিধান সরণী

কলকাতা-৬

মৈত্রেয়-কে

দিদি

দীপু

ব্যাগ গোছানো হয়ে গিয়েছিল, ভোরের ট্রেন ধরবে দীপু। কোথায় নামবে, কোন পথে যাবে, সবই সোমদা লিখে দিয়েছে। গ্রামে গিয়ে খোঁজ করবে সত্যেশ মাইতির। সোম দেখে এসেছে কয়েক বছর আগে। সত্যেশ মাইতি তার চার বিঘা জমি চাষ করে আদর্শ চাষী হবার চেষ্টা করছে।

—সত্যেশ তোমাকে তপনের কথা বলতে পারবে।

—চিনতেন?

—অবশ্যই। আমাদের সমর্থক ছিল।

—দাদা ওখানেই মারা যায়?

—যতদূর জানি, ওখানেই।

—সঠিক জানেন না?

—না। সে-সময়ে গ্রামে পুলিশ, আমরা মার খাচ্ছি, তারপরে গ্রাম ছাড়লাম।

—গ্রামের কি হল?

—দীপু! তপু ঠিক সেই কথাই বলেছিল। আমি তো আমার স্মৃতিচারণায় সবই লিখেছি। তপুর পায়েও জখম ছিল···তাছাড়া··· এটা পড়ে নিও, ফেরত দিয়ে যেও।

সোম

"বর্তমানে এগারো বছর বাদে, আগে বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর জেলে থাকার পরে এই এগারো বছর, জুড়লে বছর চৌদ্দ হল,—বর্তমানে সব মনে করে যতটা লেখা যায় লিখছি। কিন্তু ছোট ছোট বিস্মৃতি ঘটে যেতেই পারে, আমি মানুষ। এবং সম্ভবত অবচেতন কোনো কৌশলী খেলা খেলে। সব কথা সব সময়ে মনে করতেদেয় না।

যতটা মনে করতে পারছি বলছি। বর্তমানে আমি অধ্যাপক, বিয়ে করেছি। স্ত্রী স্কুলে পড়ায়। আমাদের একটি মেয়ে। এখনো আমি দমদমে ভাড়া বাড়িতে আছি। তবে কেষ্টপুরে কয়েকজন

অধ্যাপক মিলে জমি নিয়ে বাড়ি করছি সমবায় ভিত্তিতে। দুটো ঘর, খাওয়ার জায়গা, বাথরুম, রান্নাঘর। দু-কাঠা জমির ওপর বাড়ি। সবাই বলছে ওপরপানে বাড়ির দোতলা তোলা যাবে। আমার এলেমে হবে না।

বাড়ি করার আগেই আমার জীবন যথেষ্ট সুশৃঙ্খল। প্রয়োজনের হিসেবে মাঝারি ফ্রিজ কিনেছি। কেননা বাজার করি সপ্তাহে তিন দিন। ভোরে চা-পাঁউরুটি-ডাল-ভাত গরম আমি করি। কেননা মা ও মেয়ে প্রত্যূষে যায় বিদ্যালয়ে। ঠিকে লোককে এটা করো, ওটা করো বলে ঘরের কাজ আমিই করাই। আমি যখন ডাল-ভাত-তরকারি গরম করি স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে সব গুছিয়ে রেখে নিজে খাই, বাড়ি বন্ধ করে বেরোই, ওরা ফেরে। বাড়িটা একতলায়, ভেতর দিকে, ফলে নিরাপদ। আমার জীবন খুব ছকে বাঁধা এখন। সন্ধ্যার পর, ছুটির দিন, আমি নোট বই লিখি। পুরনো বন্ধুদের কেউ কেউ বলে, আমি নিরাপত্তা শিকারী হয়ে গেছি।

আমি তা মনে করি না। অন্যরকম জীবন যখন ছকে নিয়েছি, আমার স্বপক্ষে আমারো তো থাকতে হবে জোরালো যুক্তি। নিজের মধ্যে প্রশ্ন উঠলে যাতে উত্তর দিতে পারি।

বাড়ি করছি, কেন না যেমন করে হোক মাথা গোঁজার আস্তানা না করলে সাধারণ বাঙালী মরে যাবে! মাসে ছয়শো টাকা ভাড়া দিই, বছরে সাত হাজার দুশো। পাঁচ বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছি। রান্না গরম, টেবিল সাজিয়ে রাখা, সকালে চা-পাঁউরুটি, —এগুলো করি কর্তব্য হিসেবে। মেয়েছেলে বলেই সে সব করবে আর আমি বসে বসে দেখে যাব, এটা অযৌক্তিক।

নোট বই লিখি, টাকা দরকার। আমার বউও তো বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা ঘরে বসে ছাত্র-ছাত্রী পড়ায়। অঙ্ক আর ইংরিজি পড়াতে পারে, দুর্লভ যোগাযোগ। টাকা দরকার। মা দাদার কাছে থাকেন। তাঁকে মাসে একশো টাকা দিই।

আজ সক্রিয় রাজনীতি করি না। করি না বলে মনে দুঃখবোধ এখনো আছে। আমি আমাদের একদা বিশ্বাসের বাম শিবিরের কাগজ, পত্রিকা, কিনি, পড়ি। প্রত্যহের কাগজ স্টেটসম্যান। যদিও, কোনো কাগজই আর সত্যি খবর দেয় না। বউ দূরদর্শন কিনতে চায় না, বাঁচোয়া। কলেজে "দি টেলিগ্রাফ" পড়ে জানলাম, দূরদর্শনে অলৌকিক, পিশাচ, ডাইনি, এ সব ধারাবাহিক প্রোগ্রামের অতীব ভক্ত একটা আট বছরের মেয়ে নায়িকার মতো গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দূরদর্শন দেখে আমার মেয়ে যদি আমাদের বলে, বিজ্ঞাপনের মা বাবার মতো হও? নিজে যদি রসনার আহ্লাদী খুকি অথবা নির্মার নৃত্যশীলা বালিকা হতে চায়?

রাজনীতিক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়। নবেন্দু বলছে জোর দিয়ে, আমাদের বিষয়ে সবাই লিখছে। আমরা অন্তত স্মৃতিকথাই লিখি। সবটা দলিল হয়ে যাক। আমরা ক'জন লিখলেও একটা বই হবে। নিজেরা বিক্রি করব। অন্তত শহীদার বউ, আর গ্রামের দুটো পরিবারকে তো সাহায্য করতে পারব। নবেন্দু একটা সেজো কাগজে ঢুকেছে, বড় বা মেজো নয়। ও বিয়ে করেনি। ওর ছোট ভাই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করেছে। ভাইয়ের ছেলে দুটির দায়িত্ব ওর। যদিও ওর ভাইয়ের বউ ভাইয়ের আপিসেই কাজ পেয়েছে।

লিখতে শুরু করেছিলাম।

দীপু না বললেও তপুর কথা আগে লিখতাম। "সম্মুখ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে" যারা নিহত, তাদের অনেকের মতো তপুও মাঝেমাঝেই কড়া নাড়ে স্মৃতির দরজায়। হেঁকে বলে, সোম। বাড়ি আছিস? দরজা খুলে দে।

আমি বলি, তপু! এটা উনিশশো ছিয়াশি।

তখন তপু বলে, বিশ বলছিস তো? বিশ না বললে একুশের শতকে যেতে পারবি না। পর্বত যেতে দেবে না!

আমি ঘামে নেয়ে জেগে উঠি। যে কোনো লোকের মতই আমার জীবন। কলেজে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করি। অধ্যাপক ইউনিয়নে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করি। রবিবার ঝুলন্ত পাঁঠার ঠ্যাঙের মাংস চারশো গ্রাম কেনার জন্যে ব্যাকুল থাকি।

অথচ নিজের কাছে নিজে তো প্রমাণ রাখতে হবে যে আমি তারপরেও আমি। সেজন্যে বইও কিনি। আমার বউ কখনো বই পড়ে না। প্রতিবেশীর কাছে চেয়ে নিয়ে পত্রিকা পড়ে। তবে আমার বই কেনায় কোনো বাধা দেয় না। মেয়ে কমিক ভালবাসে।

আমার কাছে ধীরেন বাস্কের "সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিবৃত্ত" আছে। ধীরেন বাস্কেকে আমি চিনি না, নবেন্দু চেনে। ভদ্রলোক সরকারী কাজ করেন। আমি বোকার মতো বলি, পর্বতের বেয়াইও তো বাস্কে। তাদের কেউ নন তো?—নবেন্দু রেগে ওঠে। আমি গ্রামে গিয়েছিলাম, ওদের ঘরে ছিলাম। পর্বতের বেয়াইরা তখনি ভূমিহীন, নামাল খাটত। ওরা বই লিখবে কেমন করে? লেখা-পড়া শেখার কোন্ সুযোগটা পেয়েছে ওরা? আমি কেন বুঝি না কিছু?

বোঝাবুঝির ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

স্বীকারোক্তি করে যাই।

আন্দোলন যখন চলছিল, আমি তখনো সম্পূর্ণ বুঝিনি গ্রাম-মানুষ-দেশ কোথায় আছে, শোষণের কোন স্তরে, যতক্ষণ না আমরা কয়েকজন, একে একে নেমেছিলাম নানচক স্টেশনে। এমন ট্রেন ধরেছিলাম যাতে পৌঁছই সন্ধ্যায়।

স্টেশনের নাম নানচক।

থানার নাম পাখমারা।

নামচকে আমাদের নিতে এসেছিল সত্যেশ মাইতি, পর্বত সাঁওতাল। সত্যেশের ভাই বিদ্যাধর আমাদের কলেজে পড়ত। ওর বন্ধু হিসেবে আমরা আগে একবার ওর গ্রামে যাই। বিদ্যাধর

জেলে বিনা চিকিৎসায় মরে যায় পরে। তখন ওদের একটা দোকান ছিল নানচকে, যে দোকান ছিল খবরের কাগজের এজেন্ট। সত্যেশ দোকানে বসত মাঝে মাঝে। ওর বাবাই বসতেন। তখন ওদের জমি সামান্য। বিদ্যাধর মেধাবী ছাত্র হিসেবে রাজধানী পৌঁছেছিল।

আমরা কুণ্ডলা, সজিনা, খয়েরপুর, তেঁতুলগেড়িয়া, এই চারটি গ্রামে ছড়িয়ে ছিলাম।

নানচক থেকে পশ্চিমে মাইল তিনেক গেলেই পাখমারা। পাখমারা অবধি রাস্তা যেমন তেমন। ডাইনে ঘুরলে আর কোনো রাস্তা নেই। মাঝে মাঝে বাবলা, শাল, পলাশ ও কেঁদ গাছ। সেখানেই গ্রামগুলি এখানে সেখানে। সজিনা খালকে ওরা নদী বলত। কোনোদিন হয়তো নদী ছিল, আমরা দেখেছি খাল।

খালের ওপাশে কুণ্ডলা গ্রামে ঢোকার পথে একটা বন্ধ্যা ও বৃদ্ধ তেঁতুল গাছের চেহারা খুব অশরীরী ছিল। যেন বিশাল, অতিকায় কোনো মানুষ। সাঁকো পেরোতে হত। তপু আর আমি ছিলাম সেখানে, পর্বত সাঁওতালের ঘরে।

আমরা যখন যাই, এমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, যেন আমরা ওদের পিপাসিত প্রতীক্ষার পর ধারা বর্ষণ। কি বিশ্বাস আমাদের ওপর। পর্বত বলেছিল, তোরা মিছে বলবি না (আমার ভাষায় লিখছি), ঠিক বিশই বলবি। ডমরুধর রাজরায় আর পান্তিরাম বেরা, জোতদার নয়, জমিদার নয়, এলাকার রাজা হয়ে বসে আছে। আমাদের জমি সব ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে নিল আর যার যা আছে তাও থাকতে দেবে না।

বিশ বলব? আমার সবই ছিল ভাসা ভাসা জানা।

পর্বত বলেছিল (কয়েক দিনে) যে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে ওই "বিশ" না বলা এক দুঃসহ বোঝা ছিল। সাঁওতালদের বুকে পাষাণ ভার।

সে ছিল এক সময় যখন সাঁওতাল পরগণার বারহাইত ছিল এক

ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। অন্য জাতির মহাজন, গোলদার, আড়তদার ও কয়ালরা সাঁওতালদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত।

ভাদ্র আশ্বিনে টানের সময় কর্জ দিত ধান। মিষ্টি মুখে বলত, বিশ সেরে আধামণ, তো চার বিশ ধান নিলি বাপ। ফসল উঠলে শোধ দিয়ে আসবি।

ফসল উঠলে সাঁওতাল তো সরষে, ধান, কলাই নিয়ে হাজির। বাবু তার ধার শোধ নেবে, তারপর এ সব বেচে আসবে হাটে। শস্য দিয়েই ওরা যা কেনবার তা কিনত।

কিন্তু সাঁওতাল কি পারে বাবুদের সঙ্গে? তারা তো হিসেব, ওজন, বাটখারা, মাপ কিছুই বোঝে না। তারা গরুর গাড়ি শূন্য করে ধানের পাহাড় ঢেলে দেয়।

মহাজন বলে, এই দশ সের হল, এই এগারো সের হল! কি আনলি? এক বিশ ও হয় না?

সাঁওতালরা মরিয়া হয়ে যেত হতাশায়। সব ধান ঢেলে দিলে এক বিশ হয় না?

তারা বলত, বাবু! একবার বিশ বোল্। বিশ বোল্ বিশ বোল্ বাবু, একবার বিশ বোল্।

পর্বতের কথা বলার ভঙ্গি খুব অসামান্য ছিল। পর্বত তো চেহারাতেও পর্বত। অতিকায় জোয়ান নয়। নাতি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, তেল কুচকুচে কোঁকড়া ছোট ছোট চুল, ঘন ঘন চুল আঁচড়াত আর অপরের কথা শুনতে শুনতে যখন ওর বাধা দেয়া দরকার হত, ডান হাতটা বাতাসে ওপর থেকে নিচে ক্ষিপ্র বেগে নামাত, যেন টাঙির কোপে কথাটা কেটে দিচ্ছে। তারপর কথা বলত।

না। ওর চেহারা অতিকায় নয়। তবু পাহাড়ের মতই গম্ভীর, মাটির গভীরে প্রোথিত, তেমনি মাথা উঁচু ওর। ওর কাছে গেলে সব মানুষকেই খুব তুচ্ছ মনে হত। পার্থিব সম্পত্তি লবডঙ্কা। কিন্তু স্বভাবে ব্যক্তিত্বে যেন ও রাজা।

বাবুরা বিশ বলত না, বলবে কেমন করে? দিক জানে আমাদের ছিবড়া বানাতে। বিশ বোল্, মানে সত্যি কথা বল। আমরা কাউকে বিশ বলতে শুনিনি বলেই তো সিদো কানহু হুলটা উঠাল। তারপর থেকে কত কিছু হয়ে গেল, বয়ে গেল, পচা সিং ভূমিজ আর আমি, দুজনের বাবা ওই ডমরুধরের জ্যেঠার কথায় বুঝল যে সাহেব গেলেই আমাদের দুঃখ থাকবে না। তাতে পাখমারা থানার উপর থেকে সাহেবের নিশান নামাল, তেরঙ্গী নিশান উঠাল, জেল খাটল কত!

কে বিশ বলে বল? ডমরুধর, পান্তিরাম, সব বড় বড় নেতা দেশের, আর পচার বাবা, আমার বাবা, ভিখিরি হয়ে গেল। স্বাধীন হল, তবু জমিজমা ফেরত পেল না।

মুক্তির দশকে পর্বতরা বিশ্বাস করেছিল যে আমরা মনে এক, মুখে এক নই, ওর ভাষায়, আমরা বিশ বলেছি।

পর্বতের বয়স তখন বছর পঁয়তাল্লিশ। দুই ছেলে লবণ ও মণ্ডল। মেয়ে রাজোমণির বর নাকফুড়ি বাস্কে! রাজোমণির শ্বশুর, বর, সবাই খেতমজুর। সাত কাঠা জমিতে রাজোমণিরা শাশুড়ি, বউ শুওর পালত, মুরগিও ছিল। পর্বতের অবস্থা ওদের চেয়ে ভালো, কেন না ওর দুই বিঘা ক' ছটাক জমি ছিল। ওর চেষ্টায় করা।

গ্রামে ছ' বিঘা, দু' বিঘা, সাত কাঠা, এমন সব জমির মালিকানা ও মালিকদের বিভক্ত করে ফেলে। মুক্তির দশকের আন্দোলন ওদের এটা বুঝিয়েছিল যে আসল মালিক বেরা ও রাজরায় এবং ওদের চোখে এরা সবাই সমান।

পর্বতের বউ মঙ্গলী বলত, বিয়েটা বড় নিঃস্ব ঘরে হল। কিন্তু মেয়ের মন ওর ওপরে, কিছু বলার ছিল না।

রাজোমণি ও নাকফুড়ি (কোনো কারণ ওর নাক সত্যিই শৈশবে বেঁধানো হয়। আমরা যখন দেখেছি, নাকের ফুটো বুজে গেছে। নাম করণের পেছনেও কোনো সংস্কার বশত নির্দেশ ছিল।)

দুজনের ভালবাসা ছিল গভীর। এ-ওর দিকে তাকালে তা উছলে পড়ত। লবণ বলত, আমার বোন ছিল ছটফটে একটি চেঁড়ে,বা পাখি। নাকফুড়ি এক ব্যাধ, যে জাল পেতে পাখিটিকে ধরে নিয়েছে।

বোন বলত, তুই তো জাল পেতে রেখেছিস, সনা পাখিকে ধরতে কেন লারছিস?

সনা রাজোমণির ননদ। ওদের মেয়ে পক্ষ পণ পায়। লবণ ও সনার বিয়ে হলে সনার বাপ পর্বতের কাছ থেকে গরু না হোক, ছাগল পেত।

মঙ্গলীও বলত, বিয়ে হোক।

পর্বত বলত, এত কাল বাদে বুঝি আবার হুলটা এসে গেল।

ওঃ, চকভানপুরে শশীবাবু, কুমিরমারিতে রজনীবাবু, সব মাথা কাটা পড়েছে। বেরা আর রাজরায়ের মাথা গেল তো ওদের ঘরের সব ভয়ে পালাবে। আমরা জমিতে জমিতে তীর গেড়ে দখল নেব।

পাখমারা থানায় সে দশকের ইতিহাসের কথা ইংরিজি সাতটা বইয়ে আছে। দুটোতে যথাযথ সত্যি কথা। তিনটিতে খুব অল্প কথায় সেরে দেয়া, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার ভার বেশি। এবং আর দুটি বই সুকৌশলে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে, ধূর্ত ব্যাখ্যা করে গেছে। উদ্দেশ্য, আন্দোলনটি কত হঠকারী, তাই বলা।

এটা নতুন নয়। কৃষক হাতিয়ার নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইলে কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানা পর্যায়ে যায়। এবং পরে কোনো না কোনো সময়ে, কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় (এটা নিয়ম। কেন না আমরা বিশ বলতে জানি না, ইতিহাসগত অবস্থানই আমাদের বিশ বলতে দেয় না), এবং আন্দোলনের চরিত্রকে বলা হয় অতিবামবিচ্যুতি বা হঠকারী, এবং অবশ্যই দায়ী থাকে সে সময়ের নেতৃত্ব। কৃষক কিছু ন্যায্য দাবী পাবার আন্দোলন করুক, ক্ষমতা যেন না চায়। একা কৃষক ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, (হায়! ইতিহাস কি তাই বলছে?) তাকে হঠকারী ভ্রান্ত নীতিতে উদ্বুদ্ধ

করা, নো! নেভার! এবং কৃষক যদি উক্ত "হঠকারী" আন্দোলনেও মরে যায়, আমরা গান বেঁধে বা ফলক তুলে তাকে সম্মান জানাব।

আমি সব কথায় এখনি যাব না। যার নাম খুব প্রচারিত নয়, যার কথা সবাই বলে নি, সেই তপুর কথা বলব, এবং লবণ, নাকফুড়ি, পচা সিং ভূমিজ, আমাদের সাথীদের কথা।

ভাবতে গেলে বেদনা বোধ হত। ভাবতে ভাল লাগত, সমগ্র অঞ্চলটি ওদের স্মৃতিফলক।

কিন্তু তিন বছর আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জীপে গিয়ে দেখি, ভূগোল কত বদলে গেছে পাখমারার। নানচক থেকে পাখমারা, পথের দু'ধারে পাকা বাড়ি অনেক। অনেক দোকান পাট। যে মাঠে সত্যিই সশস্ত্র সংঘর্ষে লবণ ও নাকফুড়ি মরে, ধরা পড়ে বিদ্যাধর —যে মাঠে চলছিল যাত্রাউৎসব। এক জায়গায় দেখলাম, ভি. ডি. ও. মহলে দেখুন "অমর আকবর অ্যাণ্টনি"।

ডান দিকে, বাঁ দিকে, গাছপালা নেই। বেশ লাল মাটির রিকশা চলা রাস্তা চলে গেছে। তঁতুলগেড়িয়া হরিসভায় নামসংকীর্তনের হ্যান্ডবিলও দেখলাম।

সত্যেশ ছাড়া কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি। পর্বত না কি ঘরে ছিল না। একটু দাঁড়াতে পচা সিং ভূমিজকে দেখলাম। এক বোঝা খেজুর পাতার চাটাই রিকশাভ্যানে চাপিয়ে কোথাও যাচ্ছে। হঠাৎ কেন যেন মনে হল, ওকে ডেকে কথা বললে ও যদি বলে, সেদিন বিশ বলেছিলে, কোথায় গেলে?

সত্যেশ আগের মতই আমন্ত্রণ জানাল ওর ঘরে। বলল, পর্বতের সঙ্গে দেখা করো।

—পর্বত কেমন আছে?

—ঠিক আছে।

—...মণ্ডল, রাজোমণি...

—সবাই ঠিক আছে।

"ঠিক আছে" মানে কি ?

সত্যেশ বলে ছিল, রাজরায়ের ছেলে এবং বেরার ভাইপো দুজনে নেতা এখন। ওই পথ হয়েছে, পঞ্চায়েতী পথ। কিন্তু গ্রামের এখনো···

গ্রাম যেখানে ছিল সেখানে আছে ? ভালো হয়েছে ? জটিল হয়েছে ? আরো মন্দ হয়েছে ?

আমি দেখে আসিনি।

যদিও যাব, দেখব,আবার যাব, মনে মনে সংকল্প আজও রেখেছি। নিয়ে গেলে আমার বউ মেয়ে কি বলবে ? সেদিনই তো বউ বলছিল, পিপু একটু বড় হলে ওকে ট্রেনে চাপিয়ে গ্রাম দেখাতে হবে। পাঠ্য পুস্তকে তো পড়বে গ্রামের বর্ণনা, আর জিগ্যেস করবে, মামি, হো-আট্‌স আ ভিলেজ ?

আমি বললাম, অবশ্যই।

কিন্তু আমার চার বছরের পিপু যখন দশ বছরের হবে, তখন শেয়ালদার সাউথ সেকশানে বিদ্যুৎ চালিত লোকালে চেপে বসলেই কি গ্রাম দেখতে যাব ? কলকাতা যে প্রত্যহ নিম্নবিত্ত বাঙালীদের উগরে দিচ্ছে, তারা দৌড়চ্ছে কোথাও বাড়ি বানাতে। গ্রামেও সচ্ছলতা এসেছে কোনো কোনো পর্যায়ে।

আর কলকাতা একটু একটু করে দক্ষিণে, পূর্বে, উত্তরে, যে দিকে পারছে এগোচ্ছে। পশ্চিমে প্রহরী হুগলী নদী। নইলে নদী বুজিয়ে কলকাতা এগোত।

পাঠ্য বইয়ের শান বাঁধানো ঘাট, কলস কাঁখে গাঁয়ের বধূ, তাল, নারকেল, বাঁশ বন, দেবালয়ে শান্ত ঘণ্টা, ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় প্রদীপ, —সে গ্রাম কোথায় আছে ? গ্রামই কি অন্য রকম হচ্ছে না ? গ্রাম মানে শান্তি-প্রেম-পবিত্রতা-ধর্ম, এটা তো আর প্রত্যাশা করা ঠিক নয় ?

কোনোদিনই তেমন ছিল না।

আজ তো বদল ঘটবেই।

না, আমি এদের নিয়ে যাব না। স্মৃতিকথাটা লিখে ফেলি। তারপর যাব।

হ্যাঁ, পান্তিরাম বেরা আর ডমরুধর রাজরায়কে গণআদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, কার্যকরীও করা হয়। সে কথায় পরে আসছি, তপুর কথা বলি।

তীর বুনে দিয়ে জমির দখল বেশি দিন রাখা যায়নি। পুলিশ মার্চ করে ঢুকে ছিল। সঙ্গে সৈন্য।

সে সময়ে আমরা আন্দোলন করতে শহরে ফিরি। কি ভাবে ফিরে আসি আমরা চারজন, আমি, নবেন্দু, রানা আর বিলু সে কথাও পরে বলব।

ফেরে নাই দুই জন, জোনাকি আর তপু।

জোনাকি তার বেসেই সাপের কামড়ে মারা যায়। এটা একটা পরাজয় বলে মনে হয়। জোনাকি অ্যাকশানে সফল ছেলে। সাহসী বলব না। ভয়ের বোধ ওর ছিপছিপে অ্যাটলেট শরীরে ছিল না। পুলিশের হাত এড়িয়ে অতদিন বেঁচে অবশেষে সাপের কামড়ে মরে গেল। এটা একটা বিচ্ছিরি হেরে যাওয়া।

তপু পর্বতের ঘরের পেছনে গোহালে ছিল। ওকে বললাম আমরা কিভাবে যাচ্ছি। চার জন ছড়িয়ে পড়ছি যে যার মতো। যেমন করে হয় ট্রেনে উঠছি। ছাত খোলা মালগাড়িতে উঠব। নয় বাথরুমে লুকিয়ে যাব। টিকরাপাড়ায় নেমে যাব। তারপর কলকাতায় পৌঁছে যাব।

পর্বত গাছে হেলান দিয়ে শুনছিল। পর্বত সাঁওতাল, যার ছেলে লবণ কয়েকদিন আগে নিহত হয়েছে, সে জানে যে কোনো সময়ে পুলিশ গ্রামে আসবে।

এটা যে যুদ্ধ, এবং যুদ্ধের কালে যে হারজিত আছে, এটা পর্বত তার নিজের মতো করে বুঝেছিল। পর্বত, মণ্ডল, পচা, ওরা রাতে

আসত, চলে যেত। সজিনা খাল যত পশ্চিমে যায়, ততই ছোট ছোট গ্রাম। মূলত সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, লোধা গ্রাম। ওদের শেলটার।

পর্বত শুনছিল স্থির হয়ে।

তপু বসে ছিল। গোহাল (গোহাল, গোয়াল, গইল, কত নাম !) ঘরের মধ্যে এক কোণে নিচু মাচাং। সেখানে বসে পা ঝুলিয়ে রেখেছিল। ও আমার কথা শুনে যাচ্ছিল।

সব শুনে শান্ত গলায় বলল, চলে যা।

—চলে যা মানে ?

আমিই তখন ওদের ওপরে। দলের শৃঙ্খলা। আমি ওদের নিয়ে ঢুকেছি, আমি ওদের নিয়ে বেরোব।

—চলে যা মানে চলে যা।

—তুই ?

তপু আমার দিকে তাকাল। বলল, লবণ, নাকফুড়ি, বিদ্যাধর, সত্যেশ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মহীদা স্কুল ছেড়ে চকভানপুরে গিয়ে ফিরতে পারছে না। (মহীদা বয়সে বড়, বিজ্ঞান শিক্ষক, আমাদের শেলটার দিত, খবর পৌঁছাত, বেয়াল্লিশে জেল খাটা মানুষ। পঞ্চাশ বছরে আমাদের সঙ্গে চলে এল কেন না ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ওকেও বিশ বলেনি।) এমন অবস্থায় আমি যাব না।

—এটা ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করা তপু।

—জানি। কিন্তু গ্রামে কি অত্যাচার আসছে তা তো জানি। আমরা চলে যাব, গ্রামের কি হবে ? গ্রামে আমরা এসে ছিলাম, আন্দোলন ওরাই করল, আমরা ওদের সঙ্গে থাকলাম।

তারপর ঈষৎ হেসে, যেন ভবিষ্যৎ দেখে বলে ছিল, কলকাতায়, যে কোনো শহরে, আমরা নিরাপদ থাকব না। ঘাতক বাহিনী নেমে যাবে। শুধু পুলিশ মারবে না।

—তুই এখানে থাকলে···

—বড় জোর মরব। তোরা যা।

—একটি পাইপগান ও কয়েকটা গুলি…

—অন্য হাতিয়ারও আছে, থাকবে।

তপু একটু থেমে, যেন হালকা করে দেবার জন্যে বলেছিল, বিশ বলেছি, থেকে যাই।

আমাদের রক্তাক্ত সেই মুক্তির দশক ভুল হয়ে ওঠেনি, হয়নি উলগুলান। হাজার হাজার কৃষককে এক সঙ্গে নয়, খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে ফেলে দমননীতি নেমে আসছিল।

শহীদদের রক্তে রাঙা সেই মুক্তাঞ্চল, পাখমারা থানার কমাণ্ড এরিয়া, সেখানে তপু থেকে গেল।

আর আমরা?

কলকাতা না ফিরতে গ্রেপ্তার হলাম। আমি আর নবেন্দু। বিলু আর রানা কিছুদিনের মধ্যেই নিহত হল।

পুলিশের খোঁচড়, নানচক ইস্কুলের কেরানী পরেশ খুন হয় তারপরেই।

তপুর পরিণতি কেউ বলেনি। আন্দাজ করতে পারি তার পরিণতি কি হয়েছিল। আমি যা শুনেছি, তা এ-ওকে বলা সে-তাকে বলা কথা। এ-ওকে বলেছে গলা নামিয়ে, কয়েক মাস বাদে ও-তাকে বলেছে, আবার সময় বিরতি। সিনেমার মাঝে মাঝে দূরদর্শনে বিজ্ঞাপনের হুজ্জতির মতো এই বিরতি কালে ঘটে গেছে অনেক কিছু। তারপর আরেকজন বলেছে অন্য কোনো জনকে।

শুনতে শুনতেও তো অনেকদিন লেগেছে।

আমরা সহজে বলতাম, লিখতাম, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।

বেতনে সেপাই বরাবরই নিচে।

কাকদ্বীপে স্থানীয় কৃষক নেতা সেপাইকে বলেছিল, ভাই!

তুমি তো আটান্ন টাকা পাও। আমাদের মারছ কেন? আমরা গরিব, তুমিও ধনী নও।

কিন্তু পুলিশের বিভাগীয় উপরঅলারা তো আনারসের মতো। সর্বদেহে চক্ষু তার, দেখে বলি চমৎকার! আর, রাজনৈতিক বিপ্লবীদের ধরে ফেলার কাজটা শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে করতে করতে পুলিশের একটা সহজাত ক্ষমতা জন্মে গেছে।

নইলে আমরা টপাটপ ধরা পড়ব কেন?

বেশ কিছুকাল বাদে, জেলে যখন আমরা, তখন বারতা পেলাম কানে কানে, যে তপু নেই। পর্বত তারও ছ'মাস বাদে ধরা পড়েছে।

"তপু নেই"টা একটা ব্যাপার যা ধরে নেয়া হয়েছে। কেন না পুলিশের খোঁচড় পরেশ যখন নিহত, তখন থেকেই তপু কোথাও নেই।

পর্বতকে ধরা হলে পর্বতও বলেছিল, তপু কলকাতায় যেতে পারে, —রেলে চেপে যথেচ্ছা যেতে পারে,—পর্বত জানে না। কেন না তার গরুর বেঙ্গা রোগ হয়েছিল। গরিব সাঁওতাল সে, গরু অচিকিৎসায় মরে যাবে তা কেমন করে হতে পারে?

গরু তার বল ভরসা। গরুর দুধ তার বউ বেচে। গরুটির ওপর ওর সংসারের অর্থনীতি নির্ভর করে।

বস্তুত, পাখমারা থানার দারোগাকে পর্বত গরুর বেঙ্গা রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতো বক্তৃতা দিয়েছিল। আগেই বলেছি পর্বতের ব্যক্তিত্ব এমন, যে সে কথা বললে মানুষকে শুনতে হবে।

পর্বত তো জানত যে কুমিরমারি চিহ্নিত গ্রাম। ও সেখানে যেয়ে বসেছিল কেন?

এ কেমন প্রশ্ন? দারোগা বাবু কি নতুন এসেছ এখানে? অনন্ত খাটুয়া, পাশ না করা পশু চিকিৎসক, সে কুমিরমারিতে থাকে। লবণটা কিছু কিছু শিখেছিল বটে। কিন্তু লবণও চেতে গেল,—

তোমরাও তাকে মেরে দিলে। তবে পর্বত ছাড়া কে যেত কুমিরমারি তার রুগ্‌ণ গরুটিকে নিয়ে?

সেখানেই মাস খানেক থাকল?

জিগ্যেস করুক কুমিরমারি গ্রামকে। অনন্ত যা বলেছে তাই করেছে পর্বত। গরু খেতে পারছিল না, জাবর কাটত না, কান লটপট করত, কান আর জিভের শিরাগুলো যেন কালো সুতলি দড়ি। শিরা ফুলে উঠেছে, হিম ঠাণ্ডা, থরথর করে কাঁপছে। অনন্ত প্রথমে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে গরু আরোগ্য করে সারাতে হল, খাইয়ে খাইয়ে সবল করতে হল। এক মাস কোথা দিয়ে গেছে তা পর্বত বলতে পারে না।

অনন্ত খাটুয়া কেন, আর পাঁচজনও বলল, পর্বত সাঁওতাল তার কালো, সুলক্ষণ গরুটিকে সামনে নিয়ে বসে থাকত মাথায় হাত রেখে। সকলেই তাকে দেখেছে।

কুমিরমারি! কুমিরমারি! পর্বত যে ওখানে আছে তা বলোনি কেন?

এই দেখ! বলব কি জন্যে? পর্বত অপরাধী বলে? অপরাধ যে করে সে গা ঢাকা না দিয়ে ও ভাবে গরু নিয়ে বসে থাকে?

এতে পর্বতের হাজত বাস এড়ানো যায়নি। কিন্তু তপু সম্পর্কে সে কিছুই বলতে পারেনি।

তপুর মতো সমাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, হিংসায় বিশ্বাসী ভ্রান্ত ছেলেকে ধরালে পর্বত পুরস্কার পাবে। এ কথাও বারবার বলা হয়েছিল।

পর্বত চিন্তা করে করে বলেছিল। জানলে পরে তাকে বেঁধেছেঁদে রেখে দিতাম। দেখেছি তো ঘুরতে ফিরতে। তা দারোগা বাবু! পুরস্কারটা তোমাকেই নিতে হবে। মারো আর ধরো। পর্বত জানে না তপুর খবর।

পর্বত যেন মনে রাখে, তপুদের মতো ছেলেদের কারণেই লবণ ও নাকফুড়ি মারা গেল।

হ্যাঁ বাবু, দারোগা বাবু, পর্বত সবই মনে রেখেছে। কিন্তু তপুকে ধরবে সে কেমন করে? তপুকে ধরতে পারলেই পুরস্কার, সে তো তিনটে থানার সবাই জানে। মহিষা, পাখমারা, রনোপুর, তিনটে থানাই তো খুঁজছে তপুদের। খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায়, তারি। দারোগা বাবুরাই তাকে খোঁজ করে ধরুক ও পুরস্কার নিক।

পর্বতের যে গরু নিয়ে এত বিভ্রান্ত, সে গরু কেন পর্বতের ঘরে নেই? পর্বতের ঘরে তো ওর মঙ্গলী একটা পাকা তেঁতুল কাঠের ডাং হাতে বসে আছে। ঘরে বিধবা রাজোমণি আর কুমারী সনা কেঁদে কেঁদে ভাসছে। মঙ্গলী পুলিশ দেখলেই ডাং ওঠাচ্ছে। ঘরে কি গোহালে কোনো গরু, ছাগল, শুওর নেই।

হায় দারোগা বাবু! গরু তো ও বেচে দিতে বাধ্যই হল। ছাগল শুওর সবই গেল খদ্দেরের ঘরে। বাঁচতে তো হবে। এতগুলো পেট!

পর্বত দারোগাকে চমকিত করে নিজেই থানায় গিয়েছিল। তাকে দারোগা বাবু খুঁজছে কেন?

পর্বতের কথাবার্তা, নিজে থেকে থানায় আসা। এগুলোকে ওর সুদক্ষ অভিনয় ক্ষমতা বলেই ধরা হয়। শেষ অবধি জেলও হয় ওর। ক' বছর জেলের ভাত খেয়ে পর্বত গ্রামে ফেরে।

তপুর খোঁজে আজও পুলিশ তৎপর আছে হয়তো। তাকে "নিখোঁজ" ছাড়া কিছুই বলা যাচ্ছে না। "তপু" নামের ফাইলটি হয়তো আজও জীবন্ত। যদিও তা অন্যান্য ফাইলের মতো চাপা আছে কোথাও।

তপু মনে করে দীঘার একটি পানঅলাকেও ধরা হয়েছিল। শ্রীনাথ জেনাকে ছেড়ে দিতে হয়। পুলিশের এক মহল মনে করে সে হাজারিবাগ জেলে যে রাজনীতিক বন্দীরা নিহত হয়, তার মধ্যে যার নাম শঙ্কর, সে তপু হলেও হতে পারে।

তপু জীবিত।

তপু মৃত।

তপু নিখোঁজ।

আমি, সোম, সামান্য লোক, বিভ্রান্ত, বিভ্রান্ত বোধ করি! মাথায় যন্ত্রণা হয়। পুলিশের ওপর মহলে যদি তিনজন বিশেষজ্ঞ তিন রকম মনে করে, আমরা কি করব?

একটা কথাই মনে হয়। কে আছে, কে নেই,—কে কোথায় কেমন ভাবে মরেছে, সবই তো শেষ অবধি মুখে মুখে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

সব ছেলেরাই গেছে কোথায় ভেসে, নিরুদ্দেশে। সব ছেলেরাই গেছে কোথায় ভেসে……

কত রকমে যে তারা নিরুদ্দেশে গেল!

কারা গেল গণহত্যায় আর কারা গেল, যাচ্ছে "সম্মুখ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে।" কারা রক্ত দিয়ে কলকাতা থেকে বরানগর, অশোকনগর, গ্রাম, কত জায়গাকে ধুইয়ে দিয়ে গেল। কতজনকে ব্ল্যাকমারিয়া বেপট জায়গায় ছেড়ে দিল রাতে। বলল পালাও! পালাও! তারপর পিছন থেকে ছুটন্ত টার্গেটে গুলি। আর জেলের মধ্যে গুলি চালিয়ে কতজনকে……

ভেসে গেছে, নিরুদ্দেশে গেছে।

নবেন্দুর বাবা বলতেন, কেউ হারিয়ে যায় না। নক্ষত্রলোকে বিদেহীরা ঘুরে বেড়ায়।

আমার বউয়ের দিদি জামাইবাবু তো রীতিমতো বিশ্বাসী আত্মার অস্তিত্বে।

আমি কি করব, আমরা!

আমরা প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত যা কিছু, সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে শিখেছিলাম। সেই শিক্ষা আমাদের কত কিছুতে অবিশ্বাসী করেছিল।

সেদিনের অবিশ্বাসের তীব্রতার পেছনে ছিল যৌবনের সতেজ আত্মবিশ্বাস।

আজ অনেক বদলে গেছি আমি। কিন্তু সে অবিশ্বাস কোনো বিশ্বাসের জোরে।

অবশ্যই আমি কেষ্টপুরে ছোট্ট একটি বাড়ি তুলছি। অবশ্যই আমি নিজেকে নিয়মের ছকে বেঁধেছি। হপ্তায় তিন দিন বাজার। একদিন মাংস। দুই বছর বাদে তৃতীয় বছরে সপরিবারে বেড়াতে যাই। এখন অবধি দীঘা, পুরী, এর ওপর উঠতে পারিনি। সম্ভব নয়। কলেজ শিক্ষক আমি এবং স্কুল শিক্ষিকা বউ, আমার নোট বই আর ওর গৃহশিক্ষকতা, সব মিলিয়ে উপার্জনের অঙ্ক রোগা নয়। কিন্তু বাজার দর তো সর্বদা উর্ধ্বমুখী। হিসেবী না হলে আমার চলবে কেন? দাদা মাকে রেখেছে এই তো যথেষ্ট। আমি ল্যাজেগোবরে হয়ে গেলে সে আমার দায়দায়িত্ব নিতে পারবে না।

এখনো, নিজের মধ্যেকার আরেকটা আমির তাড়নায় সাধ্যমতো সৎ থাকি বলে নিজে মনে করি। এই মনে করাটা আত্মপ্রবঞ্চনা কি না তা আমি জানি না।

আরোয়ালে গণহত্যার প্রতিবাদ সভায় গেছি।

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যে সভায় যাব।

বন্ধুদের সাধ্যমতো খবর রাখি।

দীপু আজ সম্পূর্ণ একটা বই লিখবে বলেই "নিখোঁজ"দের যথা-সম্ভব খোঁজ করে যদি, এটাই স্বাভাবিক, যে ও নিজের দাদা তপুর খোঁজ করতে চাইবে। আমি এটা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যদি সঠিক প্রেক্ষিতে লিখতে পারো তবেই লিখো।

অর্থাৎ নিজে কিছু বলবে কিনা সে কথা আমাদর কাছে নগণ্য। গৌণ।

যথার্থ যা হয়েছিল, তাই লেখো।

এখন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। "আজ সে সব জায়গা, সে সব মানুষ কেমন আছে, কি করছে," সেটাই যে একজনের বই লেখার বিষয় হতে পারে। সে জন্যে কোনো সেণ্টার টাকা দিতে পারে, এ কথা আমাদের সময়ে ভাবা যেত না।

দীপুরা অন্যরকম সময়ে বড়ো হল।

উনিশ শো ষাটে ওর জন্ম। তপুর থেকে ও অনেক ছোট। পুর বাবা সুন্দর নাম রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারী আপিসের ধস্তন কেরানী হিসেবে (তখন মাইনেও কম ছিল) ওঁর মধ্যে যথেষ্ট াব্যবোধ ছিল। তপুর মা আর বাবার মধ্যে বাঁধন খুব শক্ত ছিল। ওর া ছিলেন কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা। এখনো বাড়িতে ছাত্রী পড়ান।

ওদের বাড়িটার সাতঘর ভাড়াটেই রেণ্ট কণ্ট্রোলে ভাড়া দয়। বাড়িঅলা ওদের কোনোদিন তুলতে পারবে না। আজও নিচে একটি ঘর, দোতলায় দুটি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম,—তার ভাড়া একচল্লিশ টাকা। এক টুকরো ছাতও আছে। একসময়ে ওই াতে আমি আর তপু ইস্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্যে চেঁচিয়ে 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত" মুখস্থ করেছি। তপুর মা খুব শক্ত মানুষ। যদিও দীর্ঘকাল ওঁর বিশ্বাস ছিল যে তপুর খবর পাবেন। জানবেন সে বেঁচে আছে।

তপুর নাম তপোব্রত, ওর বোনের নাম অন্তরা, দীপুর নাম দীপাঞ্জন।

শেষ অবধি ওরা তপু, দীপুই হয়ে রইল। ওদের বাবা মারা গেছেন। অন্তরা ঝটপট বিয়ে করে ঘোর সংসারী হয়ে বসে আছে। এটা বেশ মজার ব্যাপার।

ওই বাড়ির সাত ঘরেরের এক ঘরের ছেলে কিংশুক। তপুর চেয়ে ছোট। বি-এস-সি ফার্মা, কি সব পড়েটড়ে ও ওষুধ কোম্পানিতে ঢুকে গেল। ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল, বেশ দেবে থোবে এমন ঘরের মেয়ে আনেন।

কিংশুক আর অন্তরার ছোটবেলার প্রেম।

তপু নিখোঁজ হবার বছর দুই বাদে ওরা বিয়ে করল। বর এল একই বাড়ির পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাট থেকে। দক্ষিণের ফ্ল্যাটের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

অন্তরা একই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটে থাকে, এটা মাসিমার পক্ষে একটা আশীর্বাদ। অন্তরাও মায়ের কাছে ছেলে মেয়ে রেখে বেরোতে পারে।

আজকাল একদিকে সেদিনের মধ্যবিত্তরা নিম্নবিত্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার সচ্ছলতার একটা হাওয়া দেখা যাচ্ছে অনেক তথাকথিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। বিদেশ এখন অনেক বাড়ির কাছেই "আরেকটি থাকবার, কাজ করবার জায়গা", কোনো সুদূরের স্বপ্ন নয় আর। অন্তরার দুই দেওর এই বয়সেই মধ্য প্রাচ্যে চলে গেছে, পেট্রোডলার পাঠাচ্ছে! কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছে দুজনেই সল্ট-লেকে। অন্তরার শ্বাশুড়ি শ্বশুর সেখানে থাকেন।

সময় পালটে গেছে।

দীপুর বয়স মাত্রই ছাব্বিশ। এর মধ্যেই ও সাংবাদিক হল। সাংবাদিকতা ছেড়ে সেণ্টারে গেল। বই লেখার পর আবার কি করবে কে জানে।

ছেলেটা ভালো, তবে আমি তো ওদেরকে চিনি না। আমার যদি ওর মতো কোনো ভাই থাকত, তাকেও আমি আজ চিনতাম না।

আশা করি সৎ ছেলে।

আমাকে তো হঠাৎ বলল, আপনাদের কথা শুনছি, শুনব। নবেন্দু দা বলছে, আপনি বলছেন, সবাই বলছে। স্বাভাবিক। কিন্তু সোমদা। একটা কথা কখনো ভেবেছেন?

—কি কথা?

—দাদা যখন চলে যায় তখন আমার বয়স দশ। চলে যাবার আগে থেকেই দাদা আমার কাছে খুব দূরের মানুষ, খুব রহস্যময়। আপনারা নিচের ঘরে কথা বলতেন, আমি অবাক হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম।

—তুমি তো তখন খুব ছোট।

—নয়, দশ, কিছু একটা হব। বাবা মাকে মনে হত বুড়ো

মানুষ। শেষ বয়সের সন্তান তো! দিদি ছিল গার্জেন: স্নান করাবে, পড়াবে, রাতে ঘুমিয়ে পড়লে জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়াবে। দাদাকে মনে হত মস্ত বড়ো মাপের কোনো মানুষ।··· জানেন, চলে যাবার আগের বছর দাদা ছাতে এসে আমার ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল। শিখিয়ে দিয়েছিল কেমন করে সুতো ছাড়তে হয়, প্যাঁচ লড়া যায়, অন্যের ঘুড়ি কেমন করে কাটতে হয়। ওই একদিন দাদাকে আমি কাছে পাই।

—আমি জানতাম না।

—আপনাদের রাজনীতি···পড়ে জেনেছি···আপনাদের কাছে এসেও তো সব সময়ে সাড়া পাই নি, আবার পাচ্ছিও। কিন্তু একটা কথা সত্যি, দাদার কি হল, দাদা কি করেছিল, আমি জানতে চাই। ষোল বছর সে আমার কাছে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।

—তোমার মা? দিদি?

—মা খুব চাপা। দিদিও দাদার কথা বলতে গেলে আজও বিচলিত হয়। ওরা তো দাদার কথা আমায় কিছু বলত না। তবে বাড়িতে পুলিশ আসত, বাবা থানায় যেতেন, সে সব অভিজ্ঞতা আমাকে মনে মনে বড়ো করে দিয়েছিল। সে সময়ে বন্ধুরা বাড়িতে আসে না, আমি কোথাও যাই না। কিংশুকদা মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানা যেত।

দীপুর কথা শুনে আমি নির্বাক।

দীপু তো তপুর খোঁজে যেতেই পারে: ঝকঝকে, ছিপছিপে, ছাঁটা চুল, তীক্ষ্ণ চোখ দীপু।

দীপুকে পড়ার জন্যে আমি লেখার এই অংশটা দিচ্ছি। আমার স্মৃতিকথা আরো বড় হবে, অনেক বড়।

আমি লিখে যাই, লিখে যাই, লিখতে পেরেও মুক্তি। নবেন্দু যা করার করবে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে।

পর্বত বলত, বাবু! বিশ বোল্!

আমি সাধ্যমত বিশই বলব। তবে তাতেও সময়ের ব্যবধানের কারণে কিছু উনিশ-বিশ হবে। সে সব দেখবে নবেন্দু।

হয়তো দীপুর এই কাজ, যাকে অতীতের শবব্যবচ্ছেদ বলা যায়, দীপুর এই কাজ শেষ হলে আমাদের লেখার ফাঁক ফোকরের খামতি-গুলো ভর্তি করা যাবে।”

দীপুর মা সাধনা

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে, ভোরের ট্রেন ধরবে দীপু। কোথায় নামবে, তারপর কোথায় যাবে, সবই লিখে দিয়েছে সোম। তপুর বন্ধুদের মধ্যে সোম আর নবেন্দুই মাঝে মাঝে এখনো আসে। সোম বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। ওর বউ আর মেয়েকে নিয়েও একবার এসেছিল। কলকাতায় ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখবে। রাতে এখানে থেকে গিয়েছিল।

বউও কাজ করে। খুব স্বল্পভাষী ভদ্র মেয়ে বলে মনে হল। সোম এ বাড়িতে অনেক এসেছে। ও এসেছে শুনে অন্তরা তার ছেলে মেয়ে নিয়ে এল।

সোম তপুর ছোটবেলার বন্ধু। আগে ওরা কাছেই থাকত। দুজনে এক সঙ্গে পড়েছে বালিগঞ্জ গভরমেণ্ট স্কুলে। ক্যাম্পের মাঠে এক সঙ্গে খেলা করেছে। পাড়ার দুর্গাপুজোয় এক সঙ্গে স্বেচ্ছা-সেবক হয়েছে।

দুজনেই বনের মোষ খেদাত।

কাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, কার বাড়িতে শব বইতে লোক পাচ্ছে না, বস্তিতে কারা মারামারি করছে, সব কিছুতে ওরা ছুটে যেত।

সব বিষয়ে মাথা দিত বলে পাড়ার লোকজনও ওদের কাছে আসত।

প্রধানত তপুর কাছে।

সোম ছিল পড়াশোনায় ভালো। তপু ছিল পাজি। যতটা পড়লে আর যতটা লিখলে মোটামুটি ভালোভাবে পাশ করা যাবে, তার বেশি ও পড়ত না। সোম মন দিয়ে পড়ত। তপুকে ও সব সময়ে লীডার বলত, তপুর কথা শুনে চলত।

পাড়ার বুড়োরাও সমস্যার কথা তপুকে বলতেন। তপু না গেলে উপায় নেই, শম্ভুনাথ হাসপাতালে আউটডোরে কয়েকদিন ইনজেকশান দিতে হবে। তপু না গেলে হবে না দলবল নিয়ে, মাতাল ভাড়াটে বুড়ো বাড়িঅলার জীবন দুর্বিষহ করেছে।

তখন এখানে বস্তি ছিল। বস্তিতে মারামারি, সোডার বোতল ছোঁড়া, এ সব লেগে থাকত। তপু তার দলবল নিয়ে আজকের ভাষায় "মিউচুয়াল" করতে যেত। পাড়া উন্নয়ন কমিটিও ওর করা, আর বস্তিতে নৈশ বিদ্যালয় ওরাই খুলেছিল।

পাড়ার মেয়ে যমুনা খুব সুন্দরী ছিল। স্কুলে যাবার সময়ে দুটি যুবক ওকে জ্বালাত। তপুরা সদলে গিয়ে তাদের ধরেছিল।

—আমাদের পাড়ার একটা ইজ্জত আছে দাদা। পাড়ার মেয়েকে বিরক্ত করলে ভালো হবে না। ভটভটিয়া ওই পদ্মপুকুরে ফেলে দেব, আপনাদের মারব।

এখনকার ছেলেরা বলে, খোমা বদলে দেব, মুখের ভূগোল পালটে দেব।

পথের ওপর বাড়ি। কলকাতার ছেলেদের মুখের ভাষা সর্বদাই শুনতে পাই।

সোম, তপু, নবেন্দু, পরে সব এক পথেই গেল। সোমের মুখে একটা ছাপ আছে, শুনেছি জেলে ওকে খুব মেরেছিল। নবেন্দুর কপালে হাতে তো দাগই আছে।

সেই সোম, বউ ঠাকুর দেখবে বলে কলকাতা এল। ওরা বিকেলে

যখন এল, আমিই বললাম, রাতে এখানে থেকে যাও। আবার দমদমে ফিরবে, ছোট মেয়ে নিয়ে?

বউ বলল, আপনার কষ্ট হবে না তো?

আমি বললাম, না, কষ্ট কিসের। মশা নেই এখানে। মশারির ব্যাপার নেই। খাট বিছানা সবই আছে। দীপুও নেই। ও চারদিনের জন্যে রাঁচি গেছে বন্ধুদের সঙ্গে।

ওপরে দুটো ঘর। দুটোতেই ডবলবেডের বিছানা। দীপুর বাবা নিলাম থেকে দুটো ভালো খাট কেনেন। একটাতে আমরা থাকতাম, আরেকটায় অন্তরা আর দীপু। তপু থাকত নিচের ঘরে তক্তাপোশে।

এখন ও ঘরে দীপু, এ ঘরে আমি। নিচের ঘরে সেই তক্তাপোশ আছে, কয়েকটা চেয়ার, তপুর টেবিলটা। দেয়াল আলমারি থেকে তপুর বইপত্র পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল। শূন্যস্থান তো শূন্য থাকে না। সে আলমারিতে দীপুর বই থাকে। নিচের ঘরটা দীপুর বন্ধুবান্ধবের বসার ঘর। টাইপরাইটার খটখটিয়ে কাজ করার ঘর। রাতে ও ঘরে পুরনো পানওয়ালার ছেলে বিন্ধেলাল শুতে আসে। ঘরটাও খালি থাকে না, ওরও সুবিধে হয়। বিন্ধেলাল খুব বিশ্বাসী। পুরনো পাড়ার চিহ্ন একটা।

অন্তরা এল। ওর ছেলে মেয়ে সোমমামাকে প্রণাম করল। কতক্ষণ ধরে গল্প হল। ছেলে মেয়ে কে কোথায় পড়ে শুনে সোমের বউ অবাক।

—ইংরিজি মিডিয়ামে দেননি?

—ইচ্ছে করেই দিইনি।

—আজকাল কেউ বাংলা স্কুলে পড়ায়?

—নব্বই ভাগ তাই পড়ে বউদি।

—তবুও......

—ওদের বাবা, মামারা পড়েছে, অংশুও পড়ছে বালিগঞ্জ

গভরমেণ্টে। আমি রমেশ মিত্রতে পড়েছি, সঞ্চারীও সেখানেই পড়ছে। বাড়ির কাছেও তো।

—কলেজে?

—দেখাই যাক।

—ও সব স্কুল কি আগের মতো আছে?

—তা ভেবে লাভ কি! তবে ওদের কথা বলবেন না বউদি। আমি ওদের রোজ পড়াই। নিজে থেকে নিজের পড়া তৈরি করব, সে ওদের নেই।

—আপনি বুঝি মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন?

—মা যা কড়া ছিল! একবার তাকানোই যথেষ্ট, সোমদা না কি বাড়ি করছ সল্টলেকে?

—সল্টলেকে? তুইও যেমন! কেষ্টপুর, কেষ্টপুর। কয়েকজন অধ্যাপক মিলে সমবায় করে···তোদের মতো সুখী কে আছে বল্? দমদমেই ছ'শো টাকা ভাড়া দিই, ভাবতে পারিস? আমার বাবা ছিলেন ভালোমানুষ। বাড়িঅলা কয়েকবার বলতেই বাড়ি ছেড়ে দিলেন।

—তোমার দাদা কোথায়? মাসিমা?

—দাদা ডোভার লেনে সরকারি ফ্ল্যাটে। মা দাদার কাছেই থাকেন এখন। মাসিমা বেশ শক্ত আছেন। মা হাঁপানিতে বড্ড ভেঙে গেছেন এখন।

—তোমরা খাবে তো?

বউ বলল, না না। বেরিয়েছি যখন, বাইরেই···

—যাও, ঠাকুর দেখে এস।

সোম তাড়াতাড়ি বলল, মেয়ের বড্ড শখ!

আমার হাসি পেল। বেচারা সোম! পেছনে কি তপু দাঁড়িয়ে আছে যে ঠাকুর দেখার নামে খ্যাঁক করে উঠবে? না তুমিই সে রকম আছ?

আমি বললাম, দেখবেই তো। কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে ধানবাদ থেকেও লোক আসে। এত জাঁকজমক, এত রকম রকম প্রতিমা!

বউ বলল, সারা বছর আমাদের বেরোনোই হয় না। আমার মা বাবা এখানে থাকলে ওখানে থেকেই ঠাকুর দেখি। ও দমদমে থাকে। বাড়িটা ছেড়ে থাকা···এবার মা বাবা বেড়াতে গেছেন দিল্লি-আগ্রা-এলাহাবাদ-লক্ষ্মৌ-বেনারস। একটা রাত্তির···তা থাকা যাবে।

ওরা ঠাকুর দেখে এল।

সোমের বউ ঘুমিয়ে গেল মেয়েকে নিয়ে। আমি সোম আর অন্তরা কত রাত অবধি গল্প করলাম। তিনজনে অনেক কথা বললাম।

শুধু তপুর কথা বললাম না।

কি সুকৌশলে "তপু" নামটা আমরা বারবার এড়িয়ে গেলাম তাই ভাবি। অথচ দেয়ালে তপুর ছোটবেলার ছবি ছিল, বড় বয়সের ছবি পুলিশ নিয়ে যায়। এই ঘরে সেদিন সোম বসেছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে তপু আর সোম এখান থেকেই চলে যায়।

তপুর বাবা এ ঘরে খাটে বসেই বারবার জিগ্যেস করছিলেন, তোমরা মাইথনেই যাচ্ছ তো? তা এত কম জামাকাপড় নিলে কেন? থাকবে ক'দিন?

তপু খুব সহজ গলায় বলেছিল, বাবা! কয়েকটা দিন তো। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আমি বুঝেছিলাম ওরা মাইথনে যাচ্ছে না। কোথায় যাচ্ছে, তা তপু আমাকেও বলবে না। আমার কি বুঝতে বাকি ছিল? ওদের এমন ঘর বন্ধ করে আলোচনা,—তপুর রহস্যজনক ঢোকা ও বেরোনো,—সবই আন্দাজে বুঝতাম।

নিচ অবধি গিয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। দরজা আটকে বললাম, তপু! মাইথনে তুই যাচ্ছিস না। কোথায় যাচ্ছিস,

কতদিনের জন্যে যাচ্ছিস, সেটা বলে যা! তোর বাবার কথাটা ভাব। উনি নরম মানুষ।

তপু আমার কাঁধে হাত রাখল।

—মা! তিন দিন নয়, হয় তো কিছু দেরি হবে। তুমি আর জিগ্যেস কোর না মা। আমি উত্তর দিতে পারব না। শুধু এটা জেনো, আমি কোনো অন্যায় করতে যাচ্ছিনা। তোমার গৌরব বাড়ে, এমন কাজই করতে যাচ্ছি।

তারপর তপু বেরিয়ে গেল।

আমার দুরন্ত ইচ্ছে হয়েছিল একবার আমার ছেলেকে বুকে চেপে ধরি। আমি পারিনি। আমি দরজাটা খুলে দিলাম। সোম বলল, আসি মাসিমা।

—তুমি বাড়িতে কি বলেছ সোম?

—তপু যা বলল। আসি।

তপু বলল, চলি মা।

তপু বলেছিল "চলি"।

সোম বলেছিল "আসি"।

সোম মার খেয়ে, জেল খেটে, তবু ফিরে এল। তপু আর ফিরল না।

ওপরে উঠে এসে সেদিন কত রাত অবধি শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল কেন? ইচ্ছে হল যদি, জড়িয়ে ধরলাম না কেন?

প্রথম সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক একটু হয়ত অন্য রকম হয়। আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে তপু পৃথিবীতে এসেছিল। ব্যথায় খুব কষ্ট পাই রাত বারোটা থেকে, আর পরদিন বিকেলে তপু জন্মায়।

আমার মায়ের কাছে গিয়েছিলাম তপু হবার সময়ে। বাবা ওর একটা কোষ্ঠী করিয়েছিলেন।

সে কোষ্ঠীর কোনো কথাই শেষ অবধি মেলেনি। তপুর বাবা

নরম মনের মানুষ। কিন্তু ছাত্রকালে ছাত্রফেডারেশন না ইউনিয়ন করেছেন। মনটা খুব স্বচ্ছ ছিল। উগ্র কোনো মতামত প্রকাশ করতে দেখিনি, আবার বিশ্বাসগুলো খুব দৃঢ় ছিল। অন্তরা আর দীপু কলকাতাতেই হয়। উনি কোষ্ঠীও করাননি, মুখে ভাতের কোনো অনুষ্ঠানও নয়। আমাদের বিয়ে হয় স্বাধীনতার পরের বছর।

ওঁর বন্ধুরা কয়েকজন তখনকার সোভিয়েত প্রকাশনার ইংরিজি সব বই দিয়েছিলেন। এক সময়ে ওঁকে পার্টিদরদী বলে ধরা হত। উনিশ শো পঞ্চাশে যখন তপু জন্মায়, কম্যুনিস্ট বলে ওঁর চাকরিই বিপন্ন হয়েছিল।

পরে নিশ্চয় ক্রমে ওঁর যোগাযোগ চলে যায়। তবু ওই মানুষই মরার আগে বললেন, দীপু যেন মুখাগ্নি না করে। কোনো অনুষ্ঠানই কোর না। শ্রাদ্ধ নয়, শান্তি নয়। অন্তরারও বিয়ে হয়ে গেছে। সমাজকে জবাবদিহি করার কোনো দায় তোমার নেই।

তারপর থেমে থেমে বললেন, তপু যদি ফেরে, তা হলে এ কথা তাকে বোলো। হয়ত ও বুঝবে ওর বাপও অসৎ লোক ছিল না··· তপু তো আমার সঙ্গে কোনো কথা বলত না।

যদি আসে···বোল।

—বলব, বলব।

আমি জানতাম তপু আসবে না।

আমি বললাম, বলব।

ওঁর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়ছিল। বলতে চাইছিলাম, তুমি যখন বলতে, বন্ধুদের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে এত কি কথা বলে তপু?

আমি বলতাম, পড়াশোনার কথা।

—রাজনীতির কথাই বলে মনে হয়।

—এখন তো সবাই বলে।

তুমি যখন বলতে, তপু কোথায় যায়?

আমি বলতাম, বন্ধুদের কাছে।

—রাজনীতিতে আছে বলে মনে হয়।

—কি জানি, আমাকে তো বলে না।

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলাম, উনি আর থাকবেন না। বুক শূন্য হয়ে যাচ্ছিল।

আমরা দুজনে দুজনের বড় কাছে ছিলাম।

তিনটি সন্তানই ভালবাসার ফল।

তপুর বেলা বেশি কষ্ট পাই। তপুর মা হয়ে আমি মা হওয়া জানি। তপু আমার চেয়ে একুশ বছরের ছোট। অন্তরা মেয়ে, কিন্তু তপু আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। চাকরি করতাম, সংসার দেখতাম, তিনটে ছেলে মেয়ে,—তপু এ সব খুব বুঝত।

কর্পোরেশনের ইস্কুলের এক সহকর্মী করুণা, মোহনদাসীকে এনে দিতে একটু আরাম পেয়েছিলাম।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমার স্বভাবে ছিল না। ওদের বাবার ছিল। সবাইকে নিয়ে রাতে খেতে বসব। খেতে খেতে গল্প করব। আপিস থেকে আসার সময়ে হয় ফল, নয় বিস্কুট, কিছু আনব। জামাকাপড় ওদের জন্যে আমিই আনব। সবাই বলত, সংসারী পুরুষ, লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ।

একটা কথা এখন অন্তরা বলে, দীপুর মনে দুঃখ আছে মা! ওর দিকে মন তুমি খুব কম দিয়েছ। তখন একরকম অবস্থা ছিল……

দীপুর দিকে মন কম দিয়েছি?

দীপুর মনে দুঃখ?

আমার জন্ম উনিশ শো উনত্রিশে। দীপুর জন্ম উনিশ শো ষাটে। তপু পঞ্চাশে, অন্তরা চুয়ান্ন সালে।

দীপু জন্ম থেকেই যেন স্বাবলম্বী। তপু ছোটবেলা তবু বলত, জামা পরিয়ে দাও, জুতোর ফিতে বেঁধে দাও।

দীপু চার বছর বয়স থেকে বলত, আমি নিজে করব। আমি যথেষ্ট বড়ো হয়েছি।

দীপু স্বভাবে আমার মতো।

অন্তরা ওর বাপের মতো।

তপু ছিল নিজের মতো।

সেই যে বেরিয়ে গেল তপু, সেই যে বলে গেল "মা, চলি," সে যে আর ফিরবে না তাই কি জানি?

সব কিছু তলিয়ে বুঝিনি, তার দামই বাকি জীবন দিয়ে যাচ্ছি। যত দিন বাঁচব, একটা ক্ষত তো বহন করেই যাব। না, আমি মিথ্যাচরণ করতে পারি না। প্রথম কয়েক বছরের দুঃসহ অবস্থা কেটে গেছে।

নিজের দুঃখ নিয়ে বসে থাকতে পারিনি।

প্রতিদিন মনে হয়েছে আর পারব না।

প্রতিদিন পারতে হয়েছে।

জীবনের দাবি, জীবনের দাবি।

সব কিছু তলিয়ে বুঝিনি।

সোমের মা খুব হাউকাউ করতেন, সহজে বিচলিত হতেন।

একদিন এসে বলেছিলেন, দিদি! আমার ভাইয়ের শালা পুলিশে আছে। সে এসে যা বলল…সোম…তপু…ওরা নাকি নকশাল হয়ে গেছে।

আমি "নকশাল" নামটাও শুনেছি তখন। ছাত্র যুবাদের একটা আন্দোলন, ওরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বে,—এ সব কথা তপুও বলত আমাকে। আমারও শুনতে ভাল লাগত। আমি ভাবতাম, এ সব তো ভালো কথা। তপু ছোটবেলা থেকেই গরিবের দুঃখে দুঃখী, অত্যাচার তো দেখলে ছুটে যায়, সেই তপু নকশাল।

তপুর বাবাও তা জেনেছিল।

একদিন বলেছিল, এটাও তো একটা রাজনীতিক দর্শন। আমাকে বোঝালে কি আমি বুঝব না?

—নিশ্চয় বলব।

—নকশাল আন্দোলনের ব্যাপারে পুলিশ……

—পুলিশ কবে কোন আন্দোলনকে পছন্দ করেছে?

—তোমার কোনো বিপদ……

—আমাদের হাজার হাজার কমরেড! তপু বলে।

নকশাল আন্দোলন যে কী, তাদের কর্মপন্থা কী, তার পরিণাম কি, আমি বুঝতে চাইনি না কি? সে জন্যেই বুঝতে পারিনি? তপুর চোখে আমরা কি ছিলাম ফসিল, সেজন্যেই ও বোঝাতে চায়নি কিছু আমাদের?

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে দিন কাটে, দিন কাটে। তপুর বাবা বলে, মিসিং বলে থানায় নাম দেব?

কিন্তু থানায় যেতে হয়নি।

দিন সাতেক বাদে থানাই এসে বাড়িতে হাজির। দীপু বলল, ছাত থেকে দেখলাম, সোমদার বাড়িতেও পুলিশ। দাদা কি করেছে মা? পুলিশ কেন এল?

আমাদের পাড়ায় পুলিশ ঢোকা একটু অবাক ব্যাপার। কিরণ বাবুর মেয়ে আত্মহত্যা করতে একবার, রং কোম্পানির মালিকের বউ আর ছেলে ঝিকে খুন করার পর একবার, বস্তির মারামারিতে কয়েকবার, এ গুলো অবাক করা প্রবেশ নয়।

পাড়ায় সবচেয়ে ভালো দুটি ছেলের বাড়ির সামনে পুলিশের জীপ, ভ্যান,—আমরা হঠাৎ অতীব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি হয়ে গেলাম। পুলিশ দেখলাম তপুর বাবাকেও তুলে এনেছে।

উনি ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন।

মানুষটার সঙ্গে অনেক কাল ঘর করছি। ওর আছে ইসকিমিয়া, নিশ্বাসের কষ্ট। ওর আছে অর্শ। তা ছাড়া প্রেসারটা একটু ওপরের দিকে। বসতে ওকে জল দিলাম।

অফিসারের কথাবার্তা খুব ভালো।

—আপনি রতন মিত্র।

—হ্যাঁ।

—আপনি সাধনা মিত্র।

—হ্যাঁ।

—রতন বাবু তো নয়ন রায়কে জানতেন। আমি তাঁরই ভাই পো। কাকার কাছে নাম শুনেছি।

—ও।

—তপোব্রত মিত্র আপনাদের ছেলে?

আমি বললাম, তপুর কি হয়েছে?

—এই তো ম্যাডাম, বিপদে ফেললেন। আপনার ছেলের কি হয়েছে আপনি জানেন না?

—তার কি কোনো বিপদ হয়েছে?

—তার কোনো বিপদ হয়েছে কি না জানি না। বিপদ আমাদের, বিপদ আপনাদের।

—কিসের বিপদ?

ওর বাবা বললেন, কোনো অপরাধ করেছে?

—করে নি, করেছে। আপনার ছেলে রীতিমতো নকশাল হয়ে গেছে। তপোব্রত, সোমক, ভালো ভালো গেরস্ত ঘরের ছেলেরা···

—নকশাল হয়েছে সে জন্যে তাদের ধরবেন?

—সহযোগিতা করুন।

—কি ব্যাপারে?

—কোথায় গেছে তারা, কি বলে গেছে?

—ওরা মাইথনে বেড়াতে গেছে।

—কবে?

—দিন পাঁচেক হল।

—ক' দিনের জন্যে গেছে?

—বলে গেল তিন দিন। আবার বলল আরো দেরি হতে পারে। আমি একটু চিন্তাই করছিলাম।

—চিন্তা দূর করে যাই। মাইথন ওরা যায় নি। ওরা গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে, দিকে দিকে মুক্তাঞ্চল তৈরি করবে বলে কোনো গ্রামে অ্যাকশানে গেছে।

—অ্যাকশানে ?

—কিছুই জানেন না ?

—না।

—ওর বন্ধুবান্ধব কে কে, জানেন ?

ওর বাবা, দীপু, অন্তরা, সকলকে শুনিয়ে কঠিন গলায় বললাম, সোম আর তপু সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। কলেজে তো এক ঝাঁক বন্ধু। পাড়াতেও। (যা মনে এল বলে গেলাম) বস্তির দিলীপ, কালু, ঝণ্টে, কলেজের পার্থ, গৌতম, সব্যসাচী, নবেন্দু, বিল্হন, দেবব্রত, কত নাম বলব ?

—দাঁড়ান, লিখে নিই।

—তপুর কি হয়েছে ?

—যুগের ভাইরাস। খুব বিপজ্জনক পথ নিয়েছে ওরা। নকশাল আন্দোলন করছে। যাক। আপনারা হয় জানেন না, নয় বলবেন না। বাড়ি সার্চ করব।

—করুন।

—আপনারা এখানেই বসে থাকুন।

আমিই বললাম, এ ঘর থেকেই শুরু করুন।

এ কথা বলতে পারলাম, কেন না গত কাল ওর ঘর গুছিয়ে গেছি। কোনো আপত্তিজনক বই বা ইস্তাহার দেখিনি।

দেখলেও সে গুলো নষ্ট করবার বুদ্ধি আমার হত না। দেখিনি, এটা ঘটনা।

—এই ঘর থেকে ?

—এটাই তো ওর ঘর।

পুলিশের সার্চ করা সেদিন দেখেছিলাম। ওর পাঠ্যবই গুলো

এবং লেনিন, মার্ক্স, এঙ্গেল্‌সের রচনাবলী ছাড়া কিছুই তো পায় নি।

নিচ থেকে ওপর লণ্ডভণ্ড করে, তপুর ছবি, বই, সব নিয়ে ওরা চলে গেল।

—ছেলের খবর পেলেই জানাবেন। বলবেন, নিজে থেকে ধরা দিতে। তাতে আমরাও খুশি থাকব।

তপুর বাবা অনেক চেষ্টায় বললেন, এখন সার্চ করতে ওয়ারেণ্ট লাগে না আপনাদের ?

—ওয়ারেণ্ট ? লাগে, লাগে না। চলি। রতন বাবু নিয়মিত থানায় জানিয়ে যাবেন খবর পেলেন কি না।

—খবর পেলে আমরাও বলব। ছেলের ছবিটা তো দেখছি অনেক আগেকার।

—ইস্কুলের সময়কার।

—পরের ছবি ?

—আমাদের কারোই ছবি নেই।

হঠাৎ অফিসার দীপুকে ধরল।

—কি মাস্টার ! তোমার বক্স ক্যামেরা নেই ?

দীপু মাথা নাড়ল। তারপর আস্তে বলল, ক্লাস সেভনে উঠলে বাবা কিনে দেবেন।

—ছবি না তোলাটা ভালো নয়। আমাদের অসুবিধেয় ফেলেন। দেখা যাক, কলেজের বন্ধুরা···

অন্তরা হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় বলল, আমার দাদা কিছু করেনি, তাকে ধরবেন বলে আমরা ছবি তুলে রাখব, আপনাদের দিয়ে দেব ?

—বাঃ ! দাদার উপযুক্ত বোন বটে। সময় ভালো নয়। আপনারা প্রত্যেকে সাবধানে থাকবেন। ছেলের খবর পেলেই দিয়ে যাবেন। যে সব বাপ মা সহযোগিতা করছে, তাদের ছেলেদের বেলা আময়া লিনিয়েণ্ট।

পুলিশ চলে যাবার পর আমি, অন্তরা, মোহনদাসী, পুরো বাড়িটা

গুছিয়ে তুললাম। তপুর বাবাকে বললাম, আপিসে যেও না। বিশ্রাম করো।

—আপিসে পুলিশ গেল…

অন্তরা বলল, গেল তো গেল? দাদা তো চোরডাকাত নয়।

—পুলিশ যে জন্যে এসেছিল, সব বলবে। আজ শনিবার।

—আপিস তোমার ছুটিও হয়ে গেছে।

সারাদিন কাটল একটা ঘোরের মধ্যে। রাতে তপুর বাবা বললেন, সাধনা! তুমি কি জানো কিছু?

—না। আমি জানি না ও সঠিক কোথায় গেছে। অ্যাকশানে গেছে তাও জানি না। (একটু থেমে বললাম) জানি না সেটা ভালো। জানলেও বলতাম না! ওরা মুখ দেখে বুঝে যেত আমি মিথ্যে কথা বলছি।

ওর বাবা চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে বললেন, সারা রাস্তা আমাকে ভয় দেখাল।

—কি বলল?

—নকশালরা খুনের রাজনীতি করছে। পুলিশের চোখে ওরা খুনী। পুলিশ সকলকেই ধরবে, নেতা থেকে কর্মী। আত্মসমর্পণ করে তো ভালো। নইলে পুলিশকে মারলে পুলিশও মেরে দেবে।

এ গুলো তো আমি ভাবনা দিয়ে ধরতে পারছিলাম না। তপু কাউকে খুন করছে, পুলিশকে মারছে, পুলিশ তাকে মারছে।

সোমদের বাড়িও আমাদের বাড়ির মতো হয়ে গেল। পাড়ায় চলতে ফিরতে সবাই যেন কথা বলতে ভয় পায়।

দীপু আর অন্তরা সে সময়ে কি ভাবে স্কুলে যেত, আসত, অন্তরা কলেজেও ভর্তি হয়েছিল, আমি জানি না।

থানায় গিয়ে গিয়ে ওর বাবা একটাই উত্তর পেতেন, তপুরা মিসিং।

আমি চিঠির বাক্স দেখতাম। দরজায় টোকা পড়লে ছুটে যেতাম। ক্রমে ক্রমে কতদিন কাটল। সোমরা যখন ধরা পড়ে, তার একটু আগে আবার অন্য অফিসার এল।

পাখমারা থানা, নানচক স্টেশন, সজিনা-কুণ্ডলা-তেঁতুলগেড়িয়া গ্রাম,—এই প্রথম শুনলাম।

—তপু কোথায়?

—এবার তাকে ধরে ফেলব।

—ধরে ফেলার পর?

—দেখা যাবে।

ততদিনে আমি জেনে গেছি "দেখা যাবে" শব্দের মানে কি?

মনে মনে বলেছি, "নিখোঁজ হয়ে থাক্। ওরা যেন তোকে না ধরে। ধরা দিস না তুই।"

কয়েক বছর তপু আসবে আসবে করে আমি যেন আমি ছিলাম না। কিন্তু জীবনের দাবি তো সব চেয়ে বড়ো।

তপুর বাবা অনেক বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। ক্ষয় হতে হতে উনি বিছানা নিলেন। ততদিনে পাড়াতে আমাদের পরিস্থিতি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

মানুষ মেনে নিয়েছে তপু নিখোঁজ, সে নকশাল। সোমের মা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতেন। বাড়ি ছেড়ে চলে যাক, তবু খবর পেতেন।

সোম জেলে আছে, বেঁচে আছে।

তপুর কোনো খবরই নেই।

ছেলে তোমার হারিয়ে যেতে পারে। তবু কোন কর্তব্য তুমি বাদ দেবে?

স্বামীর চিকিৎসা, শুশ্রূষা?

দীপু ফুটবল খেলে পা ভেঙে এসে তার সেবা?

তোমার ইস্কুল, তোমার সংসার?

স্বামীর মৃত্যু, তাও মেনে নিতে হল।

আর জীবনের দাবি, জীবনের দাবি।

কিংশুক যখন বলল, অন্তরার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে যাক মাসিমা,—

মন বলল, তপু নিখোঁজ, তবু বিয়ে?

যুক্তি বলল, অন্তরা তো আমারই সন্তান। ওর বিয়ে আটকে রাখব কোন্ ভরসায়?

মুখ বলল, নিশ্চয়।

—অন্তরা চায় রেজিস্ট্রেশন।

—সে তো করতেই হয়।

—অনুষ্ঠান চায় না।

—তুমি কী চাও কিংশুক?

আমি তো ওকেই চাই। দান, যৌতুক, কিছু চাই না। মা জানেন এটা আমারি বিয়ে। তবে মায়ের কথা ভেবে বলি, একটু অনুষ্ঠান হোক।

—পুরুত ডেকে বিয়ে? যা বলবে তাই করব।

—না না, লোকজন ডেকে, যৎসামান্য।

—আমি ইস্কুলের করুণাকে ডাকলাম। বিয়ের ব্যাপারে করুণা জানে না এমন কিছু নেই।

ওই ছোট্ট ছাতে প্যাণ্ডেল হল। আলপনা পড়ল নিচের ঘরে। টুনি আলোর রঙিন জোনাকি। পাড়ার ছেলেরা এসে পড়ল। আমাদের বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে এয়োরা। বস্তির ঝণ্টে এখন ঝণ্টু কেটারিং করেছে। ওই খাবার ব্যবস্থা করল।

ওদের বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর টাকা তুলতে হল। আমার চুড়ি, হার, বালা, দুল, আংটি সব দিলাম মেয়েকে। একটা পেনডেন্ট আর একজোড়া ঝুমকো রেখে দিলাম। কোনোদিন দীপু তো বিয়ে করতে পারে!

অন্তরা বলল, তোমার বেনারসীই পরব।

তাই পরল।

কিংশুক তো নেবে না। ওকে একটা ভালো স্যুটকেস, স্যুটের কাপড়…ওর মাকে ভালো কাপড়…

করুণা বলল, নিঃস্ব হয়ে গেলে সাধনাদি?

আমি আর দীপু তো। আমার চাকরি আছে। দীপুও বসে থাকবে না। আমি যেন মুক্তি পেলাম, মুক্ত হলাম। গয়না, সোনা তখন শস্তা, বাবা দিয়েছিলেন। তপুর বাবা বেশিদিন ভোগেননি। বেশি খরচ করাননি।

ওঁর মৃত্যুতে মুখাগ্নি থেকে নিয়মভঙ্গ সব বাদ ছিল। তপু নকশাল, তপুর মা আচার নিয়ম মানল না, হঠাৎ আমার একটা বিপ্লবী ইমেজ তৈরি হল, যেটার কোনো ভিত্তি নেই। তপুকে আমি নকশাল করিনি, আর স্বামীর বেলা তাঁর ইচ্ছা পালন করেছিলাম মাত্র।

অন্তরাকে বললাম, পুরুত ডেকে বিয়ে চাস?

অন্তরা আস্তে বলল, আমরা কেউ দাদা নই। তবু তার সম্মান রেখে চলতে হবে তো? বাবা ঠাকুমা মরতে শ্রাদ্ধ করল। নিজের বেলা বলল, কিছু করতে হবে না। সেটা কী শুধু বাবার ব্যক্তিগত ব্যাপার, না দাদার কথা মনে রাখা? দাদা অনীশ্বর, আমরা কেন ও সব মানতে যাব?

—তোর শাশুড়ি…

—তার সঙ্গে তো বিয়ে হচ্ছে না।

ওর শাশুড়ি বউ বরণ, দুধে আলতা, দুধ ওথলানো সব আচারই পালন করেছিলেন। খাওয়া দাওয়া, বউ বসানো পদ্মপুকুর স্কুলে। ছুটির সময়ে স্কুলটা পাওয়া যায়। কিংশুক নিজেই সব খরচ করল। ওর অনেক বন্ধু, ওর জীবনে এটা মস্ত উৎসব।

সবাই বলে গেল, ছেলের কারণে দুঃখ পেলে। আবার মেয়ের কারণে কত শান্তি হল। বর খুঁজতে হল না, যৌতুক দিতে হল না, বরটিও হল সোনার টুকরো ছেলে।

কিংশুকের মা অন্যদের বলেন, আমি নাকি আমার মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে ওঁর ছেলেকে হাত করেছি। ওই ছেলে পেলে যে কোনো শ্বশুর পণে দানে যৌতুকে ঘর ভরে দিত। আমি নাস্তিক, মহাপাপী। এই আমিই নাকি দীপুর বিয়ে দিয়ে পণ যৌতুক নেব।

আমার কানে আসে, চুপ করে থাকি। কথায় কথা বাড়ে।

মন বলে, তপু আসবে না!

মন বলে, সে আসবে।

"তপু" নামটা একটা স্থায়ী বেদনা, যা আমার রক্তে ঢুকে গেছে, ঢুকে থাকে।

দীপু আমাকে অবাক করে দিল।

ওর জন্যে ভাবতেই হল না কিছু। পড়াশোনা নিয়ে নয়, কাজ পাওয়া নিয়ে নয়, সব ও একাই করল?

আমার চেয়ে অন্তরা ওর সঙ্গে অনেক সহজ।

অন্তরার স্বভাবই ওর বাপের মতো স্নেহবৎসল। তপু চলে যাবার পর প্রথম কয় বছর আমি খুব উদ্‌ভ্রান্ত ছিলাম এও ঠিক। তপুর খোঁজে থানাতে, লর্ড সিনহা রোডে আগে যেতাম, আর যাই না। কলেজ ইউনিয়নের ছবি থেকে তপুর ছবি নিয়ে পুলিশও চেষ্টা কম করেনি। দীঘায় কোন পানঅলাকে ধরেছিল। সে তো তপু নয়, কি যেন "জেনা"। চন্দনেশ্বরে বাড়ি, সবাই তাকে জানে।

দীপু গিয়েছিল।

এসে বলল, লোকটার দুটো বউ, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, রেডিওতে কটক স্টেশন শোনে। আমার দাদা ও সব করবে, ভাবতেও পারে পুলিশ!

অন্তরা সেই উদ্‌ভ্রান্ত সময়ে একাধারে দীপুর দিদি ও মা হয়েছিল। আর ছোট্ট দীপু আমাকে বলেছিল, তের বছর বয়স হয়েছে। এখন আমি নিচেই শুতে পারি। দাদা এসে টোকা মারলে আমিই দরজা খুলে দিতে পারি।

তাই ঘুমোত ও।

দাদা কিন্তু আসেনি।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোম আর নবেন্দু এল।

ওদের কাছে কান ভরে, প্রাণ ভরে শুনলাম তপুর কথা। ওরা বলল, গ্রাম ছেড়ে গেলে গ্রামের লোকরা একলা হয়ে যাবে সেজন্যেই তপু আসেনি।

—গ্রামেও তো নেই?

—না, সেখানে নেই।

—তপু কি নেই?

—মরতে দেখেনি কেউ, মৃতদেহ দেখেনি কেউ, কেমন করে বলা যাবে সে নেই?

আমি সেই অন্ধকারেই থেকে গেলাম। তপু "নিখোঁজ" হয়েই থাকল। পুলিশও তো তাই বলে, ও "নিখোঁজ।"

দীপু বলছে ও নিজে যাবে সেখানে।

যাক, তাই যাক। একটা কিছু জেনে আসুক। করুণা মাঝে মাঝে আসে। সেদিন বলল, তুমি যে মানো না কিছু। নইলে বারো বছর নিরুদ্দেশ থাকলে কুশপুত্তলি দাহ করে দেয়। তপু তো প্রায় ষোল বছর নিরুদ্দেশ।

আমি মাথা নাড়লাম।

তপু ব'লে একটা কুশপুত্তলি দাহ করে দেব? ধরে নেব ও মৃত? কেমন করে তা হতে পারে? কিছু করব না। উনিশ 'শ উনত্রিশে জন্ম। এ বছর সাতান্ন পুরে যাবে। কতদিন বাঁচব জানি না। শেষদিন অবধি তো অপেক্ষা করে যাব।

তপু আমার প্রথম সন্তান। বড্ড কষ্ট দিয়েছিল আমাকে। ওর জন্মের কথা যেমন মনে আছে, অন্তরা আর দীপুর বেলা অত কষ্ট পাইনি, মনেও নেই।

আজ যদি সে ফেরে, বয়স তো তার সাঁইত্রিশ হবে প্রায়। ফিরলে চিনতে পারবে?

পদ্মপুকুর স্কুলের এদিকে মস্ত বহুতল বাড়ি। ঝণ্টেদের বস্তিতে

এখন কত পাকা ঘর। ঘুঁটে দেবার বারোয়ারি পাঁচিল নেই। সেখানে ডাক্তারবাবুর ছেলেরা দুটো এক রকম বাড়ি তুলেছে।

আমাদের ডান পাশে বহুতল বাড়ি, বাঁ পাশেও। মুদীখানার পাশের মাঠটায় পাঞ্জাবীদের মস্ত গ্যারেজ। যেখানে ঝাবিলাল জুতো সারাত, সেখানে শনি ঠাকুরের ছোট মন্দির। সাট্টা খেলেই বোবা নলিন বড়লোক হয়ে গেল। কয়েক বছরে বহু মানুষ গরিব হয়েছে। অনেকে টাকাও করেছে। ডাক্তারবাবুর ছেলে সুবীর রাজনীতিতে হঠাৎ নেতা। ও হরদম বলে, মাসিমা! তপু ফিরে এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেন। আজ তার পালিয়ে থাকার দরকার নেই। এখন দিনকাল পালটে গেছে।

মুখ বলে, বলব।

মন বলে, সত্তর থেকে কয়েক বছর তপুরা তো নিরাপদ ছিল না এ শহরে, তারা নিহত হত। এখন তারা নিরাপদ? তাহলে কাগজ কেন রাজনীতিক বন্দীর কথা বলছে?

সুবীর বলে, আপনারা তেমনি রয়ে গেলেন।

সত্যিই তাই, বাড়িটাও একরকম রয়ে গেল। চুনকাম-রং-মেরামতি যে যার মতো করিয়ে নিই। সব বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো কাজ নিয়ে বা বিয়ে করে দেশ ছাড়েনি। সব বাড়ি উথলে পড়েনি বিদেশী ভোগ্য পণ্যে।

তপু এলে কী দেখবে?

কলকাতার সব রাস্তা ও গলিতেই খুঁজলে মিলবে ডলার-ফ্রাঁ-মার্ক ও কোনারে কেনা ভোগ্য পণ্য।

ছাতে ছাতে অ্যাণ্টেনা?

তপুরা রিসার্চ-ফিল্ম-সাহিত্য বস্তু?

মা বাবাকে মাম্মি ও ড্যাডি বলা সংক্রামক ব্যাধি?

তপুদের চেনা জানা সুন্দরী যমুনার মতো কয়েকটি এ পাড়ার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে আগুনে পুড়ে মরেছে?

আমাদের পাড়াতেও ড্রাগ চলছে?

তপু বলবে, কলকাতা, তুমি কোথায় ?

আমি বলব, আয় তপু আয়।

হাত ধরে ওকে নিয়ে যাব পুরনো হাজরা লেন ও আজকের মনোহরপুকুরের কাছের একটা ঝিমঝিমে গলিতে। একটা বাড়ি দেখাব।

যার দেয়ালে লেখা আছে, "জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।" কেন যেন বাড়ি মালিক দেওয়ালটা রঙ করাননি !

ওখানে তোদের সময়টা আছে।

এখনকার সময়ের সবটাই দিগজ্যাম স্যুট পরে ভি. আই. পি. কেস নিয়ে বিমানবন্দরে ছুটছে না।

খানিকটা অন্যরকমও আছে।

সেটা তুই খুঁজে নিস।

আমার তো বয়স হল, শরীর ভাঙছে।

তুই খুঁজে নিস সময়ের অদূষিত অংশ।

যাক, দীপু তোর খোঁজে যাক। ব্যাগ ও গুছিয়ে রেখেছে। তুই যে ট্রেনে গিছলি সেই ট্রেনেই যাবে। যাবার সময়ে আমিই দরজা খুলে দেব।

থাকিস, না থাকিস পৃথিবীতে, দীপু যেন জেনে ফেরে। তোরা বিপজ্জনক, তোদের বিষয়ে জানতে চাওয়াটা বিপজ্জনক নয় এখন। সময় অনেক ধূর্ত এখন, অনেক কৌশলী।

দীপুকে বলেছি, কৌশলী হোয়ো না, অসততা কোর না।

দীপু আমাকে তোদের বিষয়ে সাতটা বই পড়িয়েছে। অভিধান সামনে রেখে পড়লাম।

কয়েকটা বই কী কৌশলী, কী ধূর্ত।

তোর মতো আর কতজন নিখোঁজ রে তপু ?

যাক, দীপু যাক। তোকে জানার জন্যে ওর বড় তৃষ্ণা।

দীপু আর সত্যেশ মাইতি

আসার সময়ে অন্তরা কাঁদছিল। মা নিথর, দেওয়ালে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল।

দীপু বলল, কাঁদছিস কেন? মা কাঁদছে?

দিদি ফুঁপিয়ে উঠল, দাদা যখন গেল, আমি তো ওপরে বিছানায় বসে তোর কিংশুকদাকে চিঠি লিখছিলাম। আমার তো দেখাই হয়নি। তুই সেখানেই যাচ্ছিস।

দিদিকে রাগাবার একটা উপায় "মন্থরা" বলা। ছোটবেলা দিদি নাকি খুব নালিশ করত, দাদা ওকে বলত, কে নাম রেখেছে অন্তরা? স্বভাবে তো তুই মন্থরা।

দীপু বলল, তুই তো মন্থরা, সবই মন্থর তোর। ব্রেন কাজ করে না। ষোল বছর আগে কী করেছিস, এতদিনে ব্রেন তা জানাচ্ছে। চিঠির কথা আমি জানি। আমিই তো তোদের পিওন ছিলাম। মা বাবাকে লুকিয়ে কম পাপ করেছি?

অন্তরা চোখ মুছে হাসতে চেষ্টা করল।

—সাবধানে থাকিস।

—না, বিপদ ডাকতে ডাকতে যাব।

—মনে রাখিস।

—তুমিও মাকে দেখো। ভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছ আর তাকিয়ার মতো গোল হচ্ছ। কিংশুকদা ডিভোর্স করে দেবে।

দীপু মাকে বলল, আসি মা।

—আয় দীপু।

—ঠিক খবর আনব।

—জানি।

—তুমি সাবধানে থেক।

—তুই চিঠি লিখিস।

—লিখব। কিংশুকদাকে বোল, ঘড়িটা যেন ব্রজর দোকান থেকে নিয়ে নেয়। মেরামত হয়ে গেছে।

—বলব। ট্যাক্সিতে যাবি?

—প্রথম বাসের মতো আরাম কিসে? আট নম্বরে ওঠ, সিধে হাওড়া। তুমি ভেব না তো।

—না···ভাবব না···আয়।

বেরিয়ে এসে পথের মোড়ে সিগারেট ধরাতে না ধরাতে বাস আসছে বোঝা যায়। বেমেরামতে লজ্‌ঝড় বাস। প্রথম বাসেও যাত্রী কম নয়। দিদি! অন্তরা! মন্থরা! তুই বুঝলি না। মা ঠিক বুঝেছে কেন আমি ভোরের প্রথম বাস ধরলাম।

দাদার মতো করে দাদার কাছে যেতে চেষ্টা করছি মা। সোমদা বলেছে, রাতটা নবেন্দুদার এক মাসির বাড়ি কাটিয়ে (যিনি নিজে অপুত্রক ও মেয়েদের মা বলে শাশুড়ির হাতে খ্যাংরা খেয়েছিলেন, শাশুড়ির কাজটি ন্যায্য মনে করতেন এবং নবেন্দুদাকে শৈশবে কাছে রেখেছিলেন, তাঁকে দত্তক নেবার দুরাশায়। ছেলে আদরে বাঁদর হচ্ছে দেখে নবেন্দুদার বাবা শ্যালিকাকে কাঁদিয়ে ছেলে নিয়ে যান। পরে মাসিমা সগর্বে বলেছেন, আমার কাছে থাকলে নব নকশাল হত না) ভোরে প্রথম ট্রেন ধরে ওরা খড়গপুর যায়।

খড়গপুরে সারাদিন থাকে সত্যেশ মাইতির বোনের বাড়ি। বিকেল সন্ধের ট্রেন ধরে নানচক পেঁছিয়।

মা, আমি ভোরের ট্রেন ধরছি। এ পর্যন্ত আমি দাদার মতো। যাকে ষোল বছর দেখি না তার পদচিহ্ন অনুসরণ করা বেশ কঠিন। ও পথে অনেকে তারপর বারবার যায়। পথ ভুলে যায় সব, পদচিহ্ন ঢাকে বনের তৃণদল নয়, মোরাম, পীচ, খোয়া, রোলার। উনিশ 'শ ছিয়াশিতে খড়গপুরে আমাকে লুকিয়ে রাখার কেউ নেই, কোনো দরকারও নেই।

সোমদা বলেছে, ভগবানের দোকানে ভাত খেয়ে নিও যদি খড়গপুরে নামো।

—খড়গপুরে কী দেখার আছে?

—কিছুই না। আই আই. টি।

খড়গপুরে নেমে অবশ্য এক মহতী জনতা দেখতে পায় দীপু। বিভিন্ন দাবিতে ঝাণ্ডা নিয়ে ওরা বিনা টিকিটে কলকাতা যাচ্ছে। নর-নারী-বালক-বালিকা। শিশুরা মায়ের ট্যাঁকে। একটা অংশ আদিবাসী হবে। অন্যরা মেলানো মেশানো। নানা জাত, নানা গোষ্ঠী, নানা পরিধান। শস্তার বেল বট্স, খানিক দামী বেল বট্স, ধুতি, ময়লা শাড়ি, নাইলন শাড়ি। শিশুদের অধিকাংশের পরনে উলঙ্গতা, অলঙ্কার নাকে পোঁটা। এই বিবিধের মাঝে মিলন মহান হল সবাই কলকাতা যাচ্ছে।

অনেকের সঙ্গে দড়ি বাঁধা বোতল। বিনা পয়সায় কলকাতা। তারপর কালীঘাট-ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা-জাদুঘর। যে যেমন পারো দেখে নাও। তারপর ময়দানে এস। পাঁউরুটি খাও এবং সভায় শ্লোগান দাও। তারপর হাওড়ার পথে বাবুঘাটে মা গঙ্গার জল গায়ে মাথায় ছেটাও। মা গঙ্গাকে বোতলে ভরো। এটা এখন যথেষ্ট দেখা যায়।

খড়গপুরে সত্যেশ মাইতির বোনের বাড়ি দুর্গাবাড়ি। খোঁজা সম্ভব নয়। ইচ্ছে নেই। ঘুরে ফিরে ভগবানের দোকান খুঁজে বের করে ও। আর কয়েকটি সাধারণ দোকানের মতোই খাবারের দোকান। জিজ্ঞেস করে করে ও এ-দোকানে আসে।

—এটাই···ভগবানের দোকান?

বৃদ্ধ, একটু মোটা লোকটির পরনে হেটো ধুতি, গা খালি, কাঁধে একটি গামছা।

—হাঁ বাবু। আমিই ভগবান, আপনি?

ভগবান, জগৎপতি, ঈশ্বর, বিধাতা, বিধি, কত নামে স্মরিব তোমায়! হে গুণময়! মোহনদাসী গাইত একসময়ে।

—এখানে না কি এটাই ভালো দোকান, একজন বলেছিল। জিজ্ঞেস করে করে চলে এলাম।

—কতকাল আগে বাবু ?

—বহুকাল আগে। বেশ কয়েক বছর।

ভগবান বিষণ্ণ হাসে, ওর গুড়াখু রঞ্জিত দাঁত দেখা যায়। দীপু কেমন করে বলবে, আজ থেকে ষোল বছর আগে, ছয়টি বাবু ছেলে এখানে বসে ভাত খেয়েছিল। তাদের মধ্যে আমার দাদা ছিল।

—কয়েক বছরই হবে বাবু। এখান হতে তখন কেশিয়াড়ি, রগড়া, ভসরাঘাট, লোধাশুলি, রোহিনী, নানা থলে বাস যেত। এ পথে দোকান সব ভালো চলত। ভগবানের কী সেদিন আছে বাবু? ভালো বাস না পেলে দোকান চলে ? এখন সব গরিব মানুষ, আমারই মতোন…মেদিনীপুর স্ট্যাণ্ডে গেলে বড় দোকান পাবেন বাবু। এখানে খেলে শান্তি হবে না।

—দোকান একই রকম আছে ?

ভগবান নিশ্বাস ফেলে।

—হ্যাঁ বাবু…দোকান বড় করব, কত আশা…

—কী আছে ?

—তা ভাত…ডাল…মাছ…বাবু কোথাও যাবেন ?

—এক বন্ধু আসবে। নানচকে যাব।

—অঢেল ট্রেন। বাবু কী সরকারি কাজে…?

—হ্যাঁ, কাজ আছে।

"সরকারি কাজ" কথাটি বলাই নিরাপদ। সবাই সরকারের প্রজা। সব কাজই সরকারি কাজ, দরকারি কাজ।

—এখনি খাবেন ?

—তাই খাই।

মলিন উঁচু বেঞ্চি, নিচু বেঞ্চি। একটি সাঁওতাল এক পা তুলে এক পা ঝুলিয়ে ভাত ডাল খাচ্ছে। বিশ্বচরাচর বিষয়ে সে নির্বেদ। সামনের ভাতই সত্যি।

—কী নিবে হে হাঁসদা ?

—ভাত।

—ঘরের খবর ভালো ?

—ভালো।

—তা আমার ঘরে খবরটা দিও।

—দিব।

দীপু শালপাতায় ভাত, ডাল, কুমড়োর ছক্কা এবং এক চিলতে রুই মাছ খায়। কাচের গ্লাসে জল।

—ভাত খেয়ে পান খাবেন তো বলরামের দোকানে। ওই যে ওই দোকানটা। বলরাম আর আমি এক সঙ্গেই, এক মুষ্টি টাকা ঢেলে দোকানের জমি নিই বাবু।

—তুমি এখানে অনেক কাল ?

—অনেক কাল।

—ঘর এখানেই ?

—না। কেশিয়াড়ি। সামান্য ক্ষেতিবাড়ি আছে। ওই হাঁসদার ঘরও কেশিয়াড়ি। গেছেন সেখানে ?

—না।

—খুব বড় জায়গা এখন। টাউন বললে হয়।

—তুমি এখানেই ?

—বাবার সঙ্গে আসতাম পদ্মফুল নিয়ে। সাহেবদের সময়ে··· খড়গপুর দেখতে শোভা। রেলের টাউন। স্টেশনে ফুলের দোকান ছিল। তখন থেকে···

—তোমার বয়স কত ?

—ষাট পেরালাম।

দীপু টাকা দেয়।

—সাড়ে চার টাকা বাবু।

—রাখো।

ভগবান খুবই অবাক হয়। তারপর গভীর দার্শনিকতায় বলে, বাবুর ভালো হোক।

সাঁওতালটি ভাত খেয়ে যায়। ওর সাগ্রহ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ব্যাখ্যা স্বরূপ ভগবান বলে, হাসপাতালে ভাইকে এনেছিল। সে মরে গেল পরশু। .

—কী হয়েছিল?

—জমি নিয়ে মারামারি। পুলিশ কেস। মড়া তো কাটাছেঁড়া না করে ছাড়বে না। তারপর দাহ রে, পুলিশকে টাকা খাওয়াও। নেংটা ফকির লোকটা, সাগরে পড়েছে।

বিপদের অগাধ সাগরে নিমজ্জিত সাঁওতালটি ভাবলেশহীন মুখে শুকনো ভাতের গ্রাস খায়। হাত দিয়ে শালপাতার দনা (বাটি) থেকে ডালের টাকনা খায়, তরকারিও সে ভাবে খায়। দার্শনিক গলায় ভগবান বলে, মেখে খেতে জানে না ওরা। কোথা পাবে তরকারি? ওই টাকনা মেরে…

ওর বিপদ, বিপন্ন অস্তিত্ব, ওর ভাত খাওয়া দীপুকে সহসা বর্শা বিদ্ধ করে কোথাও। ওদের মতো লোকদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেবার জন্যে স্বপ্ন ও আদর্শ তাড়িত যুবকরা এসেছিল একদিন। আজও ওরা তাড়িত, বিপন্ন, নেংটা ফকির।

ভগবান বলে, পাতাবনীতে থাকতে হলে হাঁসদা, এবার যেয়ে সুধন্য বাবুর পার্টি কর। জলে বাস করলে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে? পাল বাবু ঝাণ্ডা বদল করে করে তোমাদের দশ ঘরকে ঝাড়খণ্ডী করে রেখেছে। তার সঙ্গে সুধন্য বাবুর মাগে ভাতারে সম্পর্ক। কোনো বিবাদ নাই। পাল বাবুর জমি নিয়ে তোমরা মরছ।

হাঁসদা বলে, কুনো ঝাণ্ডা বাঁচাবে নাই হে বেন্না! গরিবের কেউ নাই। পাল বাবু একটু সাহায্য হল নাই।

—তবে বুঝ?

—সুধন্য বাবুও লিবে নাই।

—কী করবে?

—দেখি!

ভগবান বলে, পার্টিবাজি আর দলাদলি! কত জনের পৌষ মাস, কত জনের সর্বনাশ। দেশ আর ভালো হবে না। আসুন বাবু। ওই দোকানে পান খাবেন।

বলরামের দোকানে দাঁড়িয়ে মহম্মদ রফির "ইয়ে দুনিয়া, ইয়ে মহফিল" শুনতে শুনতে দীপু পান খায়। দাদারা কি এখানে পান খেয়েছিল? তখনকার খড়গপুর কেমন ছিল? নিশ্চয় বদলে গেছে।

জায়গা তো বদলায় বছরে বছরে। দীপুদের পাড়াই কি সে পাড়া আছে? সাংবাদিক বন্ধুরা বলে, খড়গপুরেও বাতাসে নোট ওড়ে। টাকার জায়গা।

স্টেশনে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে বিকেল নাগাদ দীপু নানচকে থামবে এমন একটি ট্রেন ধরে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু বাজে। দাদার কাছে যাচ্ছে দীপু, যাচ্ছে দাদার কাছে। নানচকেই গিয়েছিল দাদারা।

সন্তোষ মাইতি ওর প্রথম গন্তব্য মানুষ।

নানচক স্টেশনে পা দিতে ওর মন এলোমেলো হয়ে যায়। স্টেশন ছোট। দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ালে পুবদিকে রিকশা স্ট্যাণ্ড, রাস্তা, দু পাশে কিছু ঘর।

এক সময়ে সাইবাবলার বন ছিল

উত্তরের পথ ব্যস্ত পথ। আসল নানচক ওটা ওই পথে এগোলে পাথমারা। পাথমারা এখন ব্যস্ত থানা। নানচক স্টেশনের পশ্চিম দিকে কিছু সাজানো, পুবদিকটা ফাঁকা। একটি বকুল গাছে পাখিদের কলরব। গাছের নিচে একটি বউ ছেলে কোলে ইটের উনোনে ভাত ফোটাচ্ছে। কাছে খেজুর পাতার চাটিতে একটি পুরুষ শুয়ে আছে। তার গায়ের ওপর গড়াচ্ছে এক উদোম বালক।

স্টেশন এখন বহু মানুষের থাকার জায়গা। দীপুর এক বন্ধু

ফোটোসংবাদিকতা করে। মহম্মদের ফোটোই সংবাদ দেয়। ওর "হোম ফর দি হোমলেস" প্রদর্শনীতে, "গৃহহীনের গৃহ" বলতে স্টেশন, গাছতলা, ফুটপাথ, এগুলোই দেখানো হয়। মহম্মদের সে সব ফোটো বম্বের এক প্রখ্যাত ঝকঝকে কাগজে বেরোবার পর মহম্মদ এখন প্রতিষ্ঠিত।

ওর সিরিজের নামগুলো খুব সরল।

খাবারের জন্য কাড়াকাড়ি।

এরাও মা।

এরাও শিশু।

এসব শিশু শ্রমিকরা কোন হারে মজুরি পায়?

দীপু বলেছিল, গরিবি ভাঙিয়ে খাচ্ছ মহম্মদ, তর্কের খাতিরে বলছি, গরিবি যদি না থাকে?

—আমীরি ভাঙিয়ে খাব।

—কেমন করে?

—একই সিরিজ হবে। দেখাব, মোদো মাতাল পার্টিতে ধনী লোকেরা নেশার ঘোরে একটা কাটলেটই কামড়াচ্ছে।—ফ্যাশান রানী মা একটু ঝুঁকে সিগারেট হাতে নার্সের কোলে বাচ্চাকে চুমে খাচ্ছে, এরাও মা!—খেলনায় সুসজ্জিত নার্সারিতে নিঃসঙ্গ শিশু দুরন্ত আক্রোশে খেলনা ভাঙছে, এরাও শিশু। এ সব শিশু শ্রমিকেরা ব্যাপারটি কঠিন হবে।

—এগুলো মর্যাল নয় মহম্মদ।

—মর্যাল! নীতিবোধ! ও সব বাত কে বাত। ওতে পয়সা নেই। তা ছাড়া এ ভাবে জনমত গঠন করা…

মহম্মদের বউ অপরাজিতা গজল গায়িকা, মদালসা, চুল খুলে ঘোরে। অপরাজিতা বলেছিল, দীপু! মহম্মদও ভীষণ মর্যাল তোমরা বড় নাকতোলা বাপু! বাঙালিরা।

—তুমি কী?

—আমি ভারতীয়।

মহম্মদ এলে আজ ওদের ছবি তুলতে পারত। এক ঔর দো বাচ্চা, বাস! ছোট পরিবার সুখী পরিবারের ছবি। কলকাতায় পথের ধারে যারা রাঁধে, তারাও এ রকমই।

—কোথা যাবেন বাবু?

রিকশাঅলা শুধোয়।

—নানচক বাজারে, সত্যেশ মাইতির দোকান।

—জানি না।

—শিবতলার পাশে।

আরেকটি রিকশাঅলা বলে, ষড়ঙ্গি অয়েল মিলের পাশে শিবতলা, জানিস না?

—দেখে নিব।

দীপু বলে, ও না জানে তো তুমি চলো—

দ্বিতীয় চালক মাথা নাড়ে।

—লাইন আছে। এখন ও যাবে। লাইনটা ভাঙা ঠিক হয় না বাবু, আপনারা বুঝবেন না। সেদিনই এই নিয়ে লাইনে মারামারি হয়ে গেল। নানচকে এখন এত রিকশা, প্যাসেঞ্জার কোথায়?

সব স্টেশনের মতো এখানেও সাইকেল শেড আছে। ট্রেন থেকে নামো, যে যার সাইকেলে চলে যাও। এক সময়ে এ সব জায়গায় ঝোপঝাড় ছিল।

নানচকের পথের দুপাশে ব্যস্ত জনপদ। ঘর, দোকান, চাল কল, তেল কল, উৎকৃষ্ট সার বিপণি, গো-মহিষ-হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের দোকান, ওষুধের দোকান। ষোল বছর বাদে কেউ আসবে বলে নানচক কেমন করে এক রকম থেকে যাবে?

এখানেই কোথাও হারিয়ে গেছে কোনো একজন, নানচক কি তা মনে রেখেছে?

সোমের কাছে, নবেন্দুর কাছে শোনা কথা!

—পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করেছিল।

—নানচক থেকে পাখমারা…

—গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি…

পথ! নানচকের পথ! কি তুমি মনে রেখেছ, কি ভুলে গেছ?

ছুটি মাঠ পেরিয়ে যায় দীপু। কোন মাঠে লড়তে লড়তে মরে লবণ ও নাকফুড়ি? ধরা পড়ে বিদ্যাধর?

ভি. ডি. ও. তে দেখুন "সংসার সাগর", শিক্ষামূলক সামাজিক ছবি। চন্দ্রা কি সতীশের ছেলেকে আপন করে নেবে না?

দীপুর সামনে, রিকশার ঝাঁকিতে সব নাচতে থাকে। এ সবের মধ্যে কোথায় নিখোঁজ হয়ে আছে দাদা? হঠাৎ মনে হয়, দাদাকে হঠাৎ দেখলে দীপু তাকে চিনবে না, দাদাও চিনবে না তাকে।

রিকশা থামে।

—কত দেব?

তিন টাকা।

চালকটি সভয় প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে। দোকানের আলোতে বোঝা যায় চালকটি নতুন এসেছে লাইনে, বোধহয় সাঁওতাল, এবং একটু বেশি চেয়েছে তা ও জানে।

দীপু ওকে একটা পাঁচ টাকার নোট দেয়, হাত নেড়ে বলে, ফেরত দিতে হবে না।

নিউ স্টোর্সের ছোট জায়গায় সাবান, তেল, বার্লি, স্নো, ক্রীম, এ সবের সমাহার। সামনে একটি বোর্ডে লেখা, কলকাতার দৈনিক কাগজ ও পত্রিকা পাইবেন।

নাতিদীর্ঘ একটি মানুষ চশমার ভেতর দিয়ে তাকায়। কপালে কাটা দাগ।

—আপনাকে তো চিনলাম না।

—আমি…দীপাঞ্জন…তপুর ভাই…সোমদা চিঠি দিয়েছে একটা। আপনি তো সত্যেশ মাইতি!

—হ্যাঁ···তপুর ভাই! তপু!

—চিঠিটা দেখুন।

চিঠিটা পড়ে সত্যেশ। খুব বিচলিত।

—তুমি তো অনেক ছোট।

—তার চেয়ে দশ বছরের ছোট।

—সোম লিখেছে···কোন ট্রেনে এলে?

—পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

—এত কাল পরে···তপুর ভাই! বোসো ভাই বোসো। দোকান এখনো খোলা আছে। কোত্থেকে আসছ? এ সব জায়গায় তো সব বলতে হয়!

—স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ সেণ্টার থেকে।

—সোমও তাই লিখেছে। চা খাবে? ওরে বলাই! দুটো চা দিয়ে যা। দুধ একটু দিও বাবা। কী যেন নাম বললে?

—সবাই দীপু বলে।

—তপু নাম তো সবাই জানে না। ওর টেক নেম ছিল বিনু। আমি জানতাম। ও! বহু বছর হয়ে গেল।

—আপনি তো চাষবাসও করেন।

—ওইটুকু নিয়েই···দোকানে থাকে আমার মামাত ভাই। আসি বিকেলে। এখন বর্ষায় তো ডাঁটা আর চালকুমড়ো। বিঘা দুই ধান জমি আছে। সোম তো এল আর গেল। গ্রামে গেল না।

—পথে একটা স্মৃতিফলক দেখলাম।

সত্যেশ প্রাচীন ধার হারায়নি। ঈষৎ হেসে বলে, লবন, নাকফুড়ি, বিদ্যাধর, ওদের কোনো স্মৃতিফলক নেই। ওটা পার্টি সংঘর্ষে নিহত সমীর মাইতির ফলক। খুব ধুমধাম হল, মন্ত্রী এসে উদ্বোধন করল।

—ওরা যে মাঠে মরে···

—তখন তো ধানক্ষেত ছিল। এখন আজ যাত্রা, কাল ফাংশান, পরশু কৃষিমেলা। বইমেলা। বইমেলাও হবে শুনছি।

—সবই খুব বদলে গেছে।

—বদলেছে, বদলায়নি। সে মাঠে এবারে তো ধুমধাম করে পর্বতরা সিধু-কানু দিবস করে গেল। অনেক কাল বাদে মাঠে গেলাম। কদম গাছটা আজও আছে। গাছের পাশে ছিল বাবলা বন। তার পিছন থেকে লবনরা তীর চালাচ্ছিল। খাস জমি, দখল নেয়া জমি। রাজরায়রা বেআইনে চাষ করত।

—পুলিশ মারল?

—পরেশ পথ দেখাল না? এ সব কথা থাক দীপু। তপুর ভাই তুমি ...মামাত ভাইটা ভাত খেয়ে আসছে। ও এলে আমরা বাড়ি যাব।

—তেঁতুল গেড়িয়াতে?

—আর কোথা?

—দাদা...সেখানে যেত?

—যেত। এখানে তাদের জন্যেও কত ঘর ছিল। বিদ্যাধরটার কথা ভাবি। কী বয়স বা হয়েছিল! ওর বউদি এখনো কাঁদে। আমার তো বালক বয়সে বিয়ে।

—আপনার চেয়ে অনেক ছোট?

—কয়েক বছরের। বাবা ছিলেন না...বাপ হতে হয়েছিল... মাথা ছিল খুব। ও যেতে মাও গেলেন...আমিও জেলের ভাত খেলাম ...মামাত ভাই খেয়ে আসুক! বাবা করেছিলেন, দোকানটা ফেলতে পারি না। বড় মেয়েটা ছুটির সময়ে দোকানে বসে। মানুষ কথা শোনায় অনেক। তা ছেলে নেই যখন, দুটোই মেয়ে, মেয়েই ছেলের কাজ করছে। কলকাতায় তো করে।

সত্যেশের মামাত ভাই এসে পড়ে। ওর নাম বলীন্দ্র, যদিও দেহটি তেমন বলীয়ান নয়। দীপুকে দেখে ও বিস্ময় দেখায় না। শুধু বলে, টেম্পোরারি, না পার্মেন্ট?

দীপু হেসে ফেলে।

সত্যেশ বলে, তোমার দরকার? চল ভাই, সাইকেলে ব্যাগটা চাপাও, হেঁটেই যেতে হবে। এখন রিকশা তো পাব না, আর তেঁতুল-গেড়ে তো পঞ্চায়েতের দুয়ো ছেলে। রাস্তাটা হবে না।

—রাস্তা কতটা?

—চার মাইল হবে। তবে আমরা শর্টকাটে যাব।

—এই পথে…দাদাও গেছে তো?

—তখন এত ঘরদোর হয়নি। বড় একটা কাশবন ছিল, লোধাদের কয়েক ঘর বসতি। আমরা ভেতর দিয়ে চলে যেতাম। সজিনা খালটা মেরামত করল, জলের হাল ফিরল, তারপর থেকে সর্বত্র ঘরদোর বাড়ছে তো বাড়ছেই।

পথ ছেড়ে ওরা ডানদিকে নামে।

—পথটা হলে দুঃখ ঘুচত।

—পথ হচ্ছে না কেন?

—সে অনেক কথা! নলিন রে! ঘরে আছু?

—আছু মাইতি বাবু।

—কুন্দবালার খবর কী বা?

—কাল হাসপাতালে নিব।

—সেই নিবি রে তুই, তেল পড়া জল পড়া করে…

চলতে চলতে সত্যেশ বলে, হাসপাতাল মানে তো স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তার যেমন হালই হোক…নলিনের বুদ্ধি দোষ। আগের বউটা গেল ভরা পোয়াতি, আছাড় খেয়ে। এই বউটার ফ্যান গালতে পা পুড়েছে, ডাক্তার দেখা। না তেল পড়া জল পড়া করছে।

—এ সব তো আছেই, না?

—খুব আছে যাকে বলে গেড়ে বসে আছে, বিশ্বাস। এ সব কেন হয় জান? হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ, কিছুই এদের মিলতে চায় না। একে জন্মগত অবিশ্বাস। তাতে বঞ্চনা। এ সব

কারণেই ওরা গাঁয়ে ওঝা-গুণীন-হাতুড়ে···পর্বত সাধে চেঁচায় ? সে জানলে নলিনকে ডাং মারবে।

—পর্বত এখনো সক্রিয় ?

—রাজনীতি করে না বোধহয়···তবে আজও সে একটা ফোর্স, যাকে বলে শক্তি। সাবধান, সামনে উঁচু।

—পথটা এমন কেন ?

—সে অনেক কথা। এবার তুমি রাস্তা পাবে। চকভানপুরের সীমান্ত দিয়ে যাচ্ছ।

—এ যে খুব ঘন বসত।

—হ্যাঁ, প্রধানের গ্রাম। ডমরুধর রাজরায়ের ভাইপো জগা রাজরায় প্রধান। বাড়িটা দেখ।

পাকা দোতলা বাড়ি।

—কলাবাগান, সবজিবাড়ি, খড় কাটা মেশিন, পাখমারাতে টকি, কি নেই ওদের !

—ওরা কি এখনো···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা ভেবেছিলাম বেরা গেল, রাজরায় গেল. পরিবার ভয়ে হাওয়া হল, এবারে সব···

—তা তো হয়নি।

—না। হয়নি। মাঝখান থেকে জেল থেকে ফিরে দেখি ওরাই আরো জেঁকে বসেছে।

—রাস্তা করতে দিল না কে ?

সত্যেশ ঘন ঘন টর্চ জ্বালা একবারও থামায়নি।

—আলো দেখে চলো দীপু। সাপের চাষ যাকে বলে !

সত্যেশ রাতে "সাপ" বলল, "লতা" বলল না।

—আরে ! তেঁতুলগেড়ে, চকভানপুর, কুণ্ডলা, সজিনা, কুমির-মারি, পাঁচটা গ্রামের মধ্যে তেঁতুলগেড়্যা, সজিনা, কুণ্ডলা, তিনটে

গ্রামের কষ্ট সমধিক। রাস্তা হবেই হবে, ফি বছর কথা হচ্ছে। চকভানপুরে জগা রাজরায় রাস্তার টাকার কি করল কে জানে। ওর গ্রামে রাস্তা দেখ! ভ্যান রিকশা যাবে, গণদরখাস্ত দিলেও কাজ হল না। তা এবার বর্ষা গেলে…

—আন্দোলনের অঞ্চলে তো রাস্তা করে দেয়।

—জীপ ঢোকার জায়গা আছে। তবে এখন তো…আন্দোলনের অঞ্চল! আন্দোলনের অঞ্চল শব্দটা শেষ অবধি বই পত্তরে থাকবে। আর কোথায়?

—তাই বিশ্বাস করেন?

—কি?

—আন্দোলনটি ব্যর্থ?

সত্যেশ হাসে।

—বড় কথা বলো দীপু।

—দাদার কি হয়েছিল সত্যেশদা?

—যতটা জানি সব বলব। এই যে, তেঁতুলগেড়ে ঢুকছ। ওই তেঁতুল গাছটা দেখ। অঞ্চলে দুটো-একটা প্রাচীন গাছ আছে, ওটা একটা। এক কালে অনেক তেঁতুল গাছ ছিল। মূলত আদিবাসী গ্রাম, আমরা চার ঘর মাহিষ্য, আর কিছু গোয়ালা ছিল। সব শুদ্ধ শ'দুই মানুষই হব। এখন সাতশো নব্বই, লোকগণনার বছরে। মানুষ খুব বেড়েছে, ঘরও বেড়েছে।

—এখান দিয়েই ঢুকতেন?

—চার দিক দিয়েই। এ পথটা দিয়ে ঢোকার আগে মহীদা চেঁচায়, আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি। তপু একদিন বলল, মহীদা! রাস্তা তো আমরাই বানাব। পথটার নাম দেব মহীতোষ রোড। ঢোকে সবাই, ঘোষণা কেউ করে না।

—দাদা এ রকম হাসি ঠাট্টা করত?

—খুব। আমার বউকে খেপাত কত! ওই, ওই দেখ তেঁতুল-

গেড়ের বিল। ওই বিলে তপু এপার ওপার করত। জল দেখেছ? কাকচক্ষু।

—মস্ত জলাশয় যাকে বলে।

—চিরকাল সবাই জানে ওটা পাঁচ পাবলিকের। জেল থেকে ফিরে শুনি ওটা নাকি চিরকাল জগাদের ছিল, জগারা ইজারা দিল সেই পরেশের ভাইকে। পঞ্চায়েতের টাকায় বিল সংস্কার হল, ফিশারির সাহায্যে মাছের পোনা ছাড়া হল। ভোগ করছিল পরেশের ভাই। সে হাজার হাজার টাকা করছিল।

—এখন করছে না?

—সব জানতে পারবে। এসো, এই যে আমার বাড়ি।

ইটের মেঝে, মাটির দেয়াল, টিন ও খড়ের চাল। কলা গাছ, ঢেঁড়শ বাগান, চাপা কল, মাঝের ঘরটি দোতলা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। দীপু বুঝতে পারে, এখানে মানুষ দুর্গের মতো ঘরই করে। চালা একটা। এক চালের নিচে যে পারে সে ঘরের পর ঘর করে।

—তুনি-টুনি কই রে? তোদের মা?

ঈষৎ কৌতূহল চোখে মেখে সত্যেশের বউ, চোদ্দ বছর ও দশ বছরের দুটি মেয়ে ঘরে ঢোকে। বউ এবং মেয়েদের চেহারা খুব লোমশ ও স্বাস্থ্যবান।

—আমার স্ত্রী সুজলা, ইনি তন্দ্রা বা তুনি, ইনি জবা বা বুনি।

সুজলা···দীপু সেই তপুর ভাই।

—সাদৃশ্য তো নেই।

—দীপু বড় একটা রিসার্চ সেণ্টার থেকে এসেছে।

সুজলা হাসে।

—না কি রাজনীতি করতে?

—না বউদি আমার সে এলেমই নেই। আমি নেহাৎ ছা পোষা মানুষ।

—বিয়ে করেছ, ভাই?

—না না, কি যে বলেন?

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—বলবে, সবই বলবে! জিরোক আগে। ওর কি এত হেঁটে অভ্যেস আছে? জিরোক, খাক্, ঘুমোক।

তুনি বলে, ওপরে শোবেন, বাবা?

—হ্যাঁ রে, আমিও। আগে দরজা বন্ধ কর।

—ডমনদা আসুক।

—এলাম গো আমি।

ডমন ঢুকে পড়ে

—ইনি ডমন মুর্মু।

ছোট খাট, পাকানো চেহারার এক সাঁওতাল। চোখে পড়ার মতো ঘন বাবড়ি চুল কাঁধ অবধি। চুল অসম্ভব ঘন কোঁকড়া। বয়স বোঝা কঠিন। এটা দীপু আগেও দেখেছে মাইথনে, দুর্গাপুর—কাঁকসায়, অন্যত্র। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রত্যহের পরিচয় না থাকলে যায় না বোঝা বয়স। বাইরের মানুষের মনে হয়, চল্লিশ বা পঞ্চাশ ছুঁয়ে মানুষটির চেহেরা বয়সহীন হয়ে যায়।

সত্যেশের মেয়ে বুনি বলে। ডমনদা! ইনি নতুন লোক! তুমি চুল দিয়ে কি কি করতে পার বল?

ডমন এই প্রশ্নটি অনেকবার শুনেছে, অনেকবার উত্তর দিয়েছে।

ও কোনো দিকে না চেয়েই বলে, চুলে বেঁধে ভটভটিয়া আটকাব, শাবল তুলে নিব। পাথর তুলে নিব।

ঘরের কোণ থেকে বিছানা পাটি নিয়ে ও বেরিয়ে যায়। একটি টর্চ ও একটি পুরুষ্টু লাঠি নেয়।

সত্যেশ বলে, মশারি দিলেও টাঙাবে না, কবে মরবে ডমন! এই বর্ষা!

অন্ধকার থেকে ডমন বলে, তিনবার কাটল, হাসপাতাল হতে

বেঁচে ফিরলাম, লয়? বিষে দেহটো বিষপাথর হয়ে যেইছে, তা দেখ আর বিষের জায়গা নাই। আর ধলাটো তো আছে!

নাম ধলা হলেও কুচকুচে কালো একটি কুকুরকে এখন দেখা যায়।

—দরজা দেনগো আপনারা।

দরজা শক্তপোক্ত। খুব ভারি খিল। কড়ায় তালা পড়ে।

—চোরডাকাতের ভয় খুব?

—এলেই হল। যা পারল নিল, বড় রাস্তায় উঠল, গেল এদিকে সেদিক। চোরাই মাল নেবার লোক তো বসে আছে।

সুজলা বলে, থাকুক ও সব কথা। হাত মুখ ধোও তোমরা, কাপড় ছাড়ো।

দীপু বলে, স্নান করা যায় না?

সুজলা বলে, আজকে থাক। আনকা জায়গা, ঠাণ্ডা লেগে যাবে হঠাৎ। কাল করো। আমি কিন্তু "তুমি" বলছি।

সত্যেশ বলে, সে তো ভাসুরকেও বললে।

—এই দেখ! জীবনে দেখিনি, কচি চেহারা, তুমি বলে ফেললাম। এত মানুষ আসে যায়, খেয়াল থাকে না।

—আপনি হরদম বাইরের মানুষ আনেন সত্যেশদা?

সত্যেশ হাসে, হয়ে যায় ভাই। নানা কাজে নানা জনের সঙ্গে আলাপ হয়!

ভিতরের বারান্দার নিচে বালতির ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধোয় ওরা। তারপর আবার আসে ঘরে। সত্যেশ বলে, তপু ওই বিলের জলেই নেমে যেত রাত বিরেতে। সাঁতার কাটতে জানত বটে।

—বরাবর কাপ মেডেলও পেয়েছে। খেলা, সাঁতার, দৌড়, সব-তাতে...

সুজলা ও তুনি হাতাহাতি ভাত বেড়ে আনে। ভাত, তরকারি, ঢেঁড়স ভাজা।

—কষ্ট হল খুব !

—কিছু কষ্ট না।

—সারাদিন তো ভাত খাওয়া হয়নি।

—খড়গপুরে ভগবানের দোকানে···

সত্যেশ বলে, কে ওর দোকান চেনাল ?

—সোমদা বলেছিল।

—ভগবান ! এখনো আছে, তাই না ?

—আপনি যান না ?

—না। খড়গপুরে গেলেও ওদিকে···এ রকম হয়। কলকাতা গেলেও সোম···নবেন্দু···অবশ্য যাই কম।

তুনি বলে, নিজেও যাও না, আমাদেরও নিয়ে যাও না।

সুজলা বলে, থাম বাবু, ঘরদোর ফেলে অত বেড়ায় না। যারা যায় তারা যায়। আমরা পারি না।

সত্যেশ যেন একটু অবাক হয়ে বলে, তখন যাওয়া আসা এত ছিল না, ইলেকট্রিক ট্রেনও হয়নি, তবু যোগাযোগ বেশি ছিল। এখন দিনে দিনে যেয়ে ফেরা যায়, যোগাযোগ নেই।

সুজলা আর কথা বলে না। একটি নিশ্বাস ফেলে।

—চল, বুনি, তুনি চল।

সত্যেশ বলে, বলুর কথা কেমন ! দীপুকে দেখে বলে, পার্মেন না টেম্পোরারি ?

তুনি খুব হাসে, কাকা নিজে তো চার দিনের জন্যে এসে চার বছর রয়ে গেছে। তাই শুধোয়।

—ওঠো দীপু।

মাটির বাড়ির দোতলা মাঝ কোঠায় দীপু কখনো থাকেনি। ঘরের মেঝেতে বিছানা। গায়ের কাছে জানলা খুললে জোলো বাতাস। জানলায় জাল বসানো।

—মশারি লাগাব এখন।

—মশা আছে ?

—নেই বললে হয়। মশারি টাঙানো অন্য কারণে। এ বছরে সাপের উৎপাতটা বেশি।

—ডমন আপনার চৌকিদার ?

—ডমনের এক কাণ্ড! বউ যতদিন ছিল, নিত্য চেঁচামেচি। ছেলে বউ, সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যেত। ভুটো মরে গেল। এখন ও বলে, ঝগড়া নেই, ঘরে ভাল লাগে না। দিনে নানচক যেয়ে ভ্যানরিকশা চালায়, রাতে এখানে শোয়। ওর ছেলে খড়গপুরে পোস্টাপিসে কাজ করে। আরেক ছেলে কাছেই ননফর্মালে পড়ায়। ডমন যেমন ছিল তেমন আছে। ওর বাড়ির সবাই অন্যরকম।

—চুলে অতই জোর ওর ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই তো দেখাত। তাতে একসময়ে কথাও উঠেছিল যে ওর চুলে ডানপিশাচের ভর হয়। তাতেই বউ ঝগড়া করত।

—ডাইনিতে বিশ্বাস!

—এখানে সে বিশ্বাস থেকে কোনো জল গড়ায় না। চারপাশে টাউনের হাওয়া! তা ছাড়া যে সব জায়গায় আন্দোলন হয়, সে সব জায়গায় মানুষ হয়তো খানিক আগায়!

—ডমন এখানে আগেও ছিল ?

—এসেছে বছর এগারো হল। বললাম না, নতুন মানুষ জন অনেক এসেছে, আসছে। শুয়ে পড়ো।

—একটু কষ্ট দেব।

—বলো। দাঁড়াও, বিড়ি ধরাই। সিগারেটের চেয়ে বিড়িই ভাল খাই আমি। বেশি খাই না। দেখ, কেমন জল নামল! নামুক, নামুক, পুষ্করিণী কুয়া ভরুক, চাষ হোক, গাছপালা বাঁচুক, দীপু! তপুর কি হয়েছিল শেষ অবধি তা আমি জানি না। তুমি তো তাই জানতেই এসেছ ?

দীপু বাইরের দিকে তাকায়। ঘরের ছামু অনেক দূর। জল গড়িয়ে যায়, ঘরে আসে না। জানলা দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে দেখা যায় ধোলা মেঘে গাঢ় ধূসর আকাশ।

—দাদার কি হয়েছিল সোমদাও বলতে পারে না। এখান থেকে সবাই ফিরে যায়, দাদা যায়নি।

—জানি। সে বলেছিল গ্রাম ছেড়ে যাব না। কিন্তু সে কথা তো বলে পর্বতের ঘরে বসে, বলে সোমকে।

—আপনি জানেন তো।

—তখন নয়, পরে জানি। কি করছ?

—দাঁড়ান, টেপরেকর্ডার অন করি।

—করবে?

—আপত্তি আছে?

সত্যেশ হাসে।

—তোমার বয়স কত?

—ছাবিবশ পুরে সাতাশ চলছে একমাস হল।

সত্যেশ জানলার কাছে বসে আছে। হ্যারিকেনের আলোতে দেখা যায় গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। মুখ ভাবনার গভীরে। ক্রমে ওর গলার স্বর বদলে যায়। মৃদু, অথচ কঠিন।

—আমার তেতাল্লিশ। তখন বয়স ছিল সাতাশ। বিদ্যাধরের একুশ। আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি, সুজলার তখন পেটে ছেলে। পুলিশের কাছে হাজিরা, জবাবদিহি, বিদ্যাধর আর আমি জেলে, গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। অনেক চিকিৎসার পর তুনি আর বুনি হয়। তা আমি কি করেছি তখন, কতটা জড়িত ছিলাম, তা সবাই জানে এখানে। যে শুনতে চায়, বলি। তোমাকে মুখে যদি বলতে পারি, টেপ করতেও দিতে পারি। আর রাজনীতি করি না। প্রচার দিতে যাব না যেমন, লুকাবারও কিছু নেই। আর স্থানীয় লোকজনের

একাংশ আমাকে "নকশাল" বলেই চলবে। ডমন এখানে ঘুমায়। তাতেও সন্দেহ করে।

—আমাকে মাপ করবেন।

—না না, "সরি" বলে সেরে দেবার ব্যাপার নয়। আমার অবস্থাটা বোঝাই। খুবই চিত্তাকর্ষক হে দীপু! চিন্তা করার মতো। চিন্তা আমি করি। মস্তিষ্কের সেলগুলিকে চালু রাখি। মেশিন, মগজ, বাড়ি, ব্যবহারে না রাখলে সবই নষ্ট।

—কি চিন্তা করেন?

—সে সময়ে সবাই একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু সাজো, পচা, আমি, তিনজনের অবস্থান এক নয়। আর পর্বত সাঁওতাল আমাদের চেয়ে অনেক অন্ত্যজাতের। রাজনীতি করি বা না করি, এলাকায় যদি কেউ বিজ্ঞান ক্লাব করে, আকুপাংচার সেণ্টার করে, পাখমারায় করে ড্রাগ অ্যাকশান ফোরাম, কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করে, তারা ধরেই নেয় যে সত্যেশ মাইতি তাদের সঙ্গে আছে।

—থাকেন?

—আমার মতামত কে জানতে চায়? ধরা গেল এ সব কাজ ভালো, আর হ্যাঁ, আমিও "হ্যাঁ" বলি।

—তারপর?

—যারা নজর রাখে, তারা তাতে আরো দৃঢ় বিশ্বাস করে, অথবা বিশ্বাস না করেও, বলতে হয় বলে বোলে চলে, যে সত্যেশ আজও…

—খুব জটিল।

—বোঝো, বুঝতে চেষ্টা করো। অতঃপর, আজকাল তো এ বিক্ষুব্ধ, সে বিক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ মানুষ কয়েকজন হলেই কর্তাদের চোখে একটা "দল" হল। তারাও চলে আসে। এই যে মানুষ আসে, তারা কখনো ভাবে না যে আমি একজন "একদা আছিল" হয়ে গেছি। তারা মনে করে একদিন এ রাজনীতি করেছিল, হয়তো আজও অসৎ নয়। অন্তত খুব গোছাতে পারেনি অবস্থা তাড়াতাড়ি

অতীতকে দোষারোপ করে, ক্ষমতাশালীদের কাছে নিজেকে "অনুগত" প্রমাণ করে।

—অর্থাৎ……

সত্যেশ হাসে।

—আমি অতীতের ছাপই ওদের চোখে বহন করে চলেছি। সে কথাতে তো "না" বলি না। আজ যত নিষ্ক্রিয় থাকি, অস্বীকার করি না অতীতকে। উপায় কি? কে জানে না এখানে? বিদ্যাধর আমার ভাই ছিল…বেরার আটাকল যেখানে সেখানে আমার বাবার জমি ছিল…সবাই সব জানে। অতএব দাঁপু! আমার লুকোবার নেই কিছু কারো কাছে।

—আপনার অবস্থা তে …

সিঁড়ি দিয়ে ধুপ ধুপ করে উঠে আসে সুজলা। বলে, পান জর্দা নিয়ে এসেছি। একটু কথা শুনি।

সত্যেশ বলে, আমি যেখানে ছিলাম, সেই গ্রামেই থেকে গেলাম। আমাকে একই জায়গায় সে সব মানুষজনের মধ্যেই থাকতে হয়। সর্বদা আমাকে "আজও নকশাল" মনে করার কোনো কারণ নেই, মনে করা হয়। তবে কি জানো মাথা উঁচু রেখেই চলাফেরা করি। সে কারণে সম্মান পাই। মেয়েদেরও বলি, আচার-ব্যবহারে এমন হবে, যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে। বিয়ে ওদের হবে না।

সুজলা বলে, বিয়ে ওদের হবে না।

—বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দেবার সাধ্যও নেই, দেবও না। বড়টাকে নার্সিং শিখতে দেব, ছোটটাকে দেখি হোমিওপ্যাথি পড়াব। তাতেও সম্মানজনক কেরিয়ায় হয়।

সুজলা বলে, এখন তো কত মেয়ে করছে। আমাদের সময়ে? আট ক্লাস না হতে বাড়িতে থাকো। ষোল না পুরতে বিয়ে। এ তো তখন কম্যুনিস্ট পার্টি করত। সে সব বলো?

—না, চৌষট্টির পর আর···

—ক্যাসেটটা অন করি? আপনি কথা বলুন। বউদির যা বলবার বলবেন। আপনারা ভাববেন না।

—অন্?

—অন্।

—সুজলা স্তুতি দিয়েই শুরু করি। বড় বংশের মেয়ে। বাবা, কাকা সব কংগ্রেসী। জমিজমাও ভালো। আমার ঘরে এসে কেমন করে সব মানিয়ে নিল! বিদ্যাধরকে কলকাতায় পড়ানো ওরই চেষ্টা। গরু সামলানো, সবজিবাড়ি দেখা, স—ব ও একা করেছে।

—থাক, আমার কথা থাক।

—আর আমরা যখন ধরা পড়ি, তারপর সাতমাস গর্ভ নিয়ে পুলিশকে কিভাবে তাড়িয়েছে! কাগজপত্র পুড়িয়েছে আগে, বিদ্যাধরের ছবিটাও সরায়। তারপর পাখমারা থানায় হাজিরা দিচ্ছে ওদিকে, বাড়ির সর্বস্ব পথে ফেলেছিল পুলিশ। সব ওর ওপর দিয়ে গেছে। তারপর মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ছুটো মহিষের পিঠে আড়মাচায় ওকে শুইয়ে কারা হাসপাতালে নিয়েছিল জান?

—আমিই বলি। তাদের ঘরে তাণ্ডব, কিন্তু পর্বতের বউ, পচার বউ, মহীদার বউ, মহীদার ছেলে, কে আমাকে ধরেছে, কে মোষ টেনে নিচ্ছে, সে সময়ে অফিসার থানার, সে বলে, মুখে ছাতা ধর। ওরা শুনেও শুনছে না। শেষে মঙ্গলী বলল, ছাতা লিবে কেনে? পেটের ছেলেটা ফিরে দে! তোদের দালে মানে মারধোরে তো এমন হল। অফিসার বলে, মরে যাবি পর্বতের বউ। মঙ্গলী বলে, মেরে ফেলা। আমি আমার বেটার কাছে যাব। তুই কি থাকবি?

—হাসপাতালে ওঁকে দেখেছিল?

—হ্যাঁ, পুলিশ প্রহরায় ওঁর অপারেশন হয়। সুজলা তখন ভি. আই. পি। সে অবস্থাতেও বড় অফিসার অশোক চাটুজ্জে একে

জেরা করে যাচ্ছে। সুজলা "জানি না" ছাড়া "হ্যাঁ" বলেনি। ফিরে এল যখন, তখন তো নিঃস্ব কাঙাল। বাবার কাছে যায়নি। ভাইয়ের কাছে যায়নি। শেষে শ্বশুর বললেন।

—তুই না গেলে কেমন করে সত্যেশের খোঁজ করি, ব্যবস্থা করি? ও বলল, বিদ্যাধরের খোঁজ কে করবে? শ্বশুর বলে ফেললেন, সে নেই। তা শুনে আবার অজ্ঞান। আমার বউ যে বীরাঙ্গনা তা তো পরে জানলাম, তারপর কবে ও ফিরল, শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করে, আবার জমি কিনল, ঘর ওঠাল, আমি ফিরতে প্রথম কথা বলল, তাকে কোথায় রেখে এলে?

সুজলা আস্তে বলে, তুমি ঘরে থাকতে? সেই ছিল আমার সঙ্গী। রাজনীতির কথা আমাকে কত বোঝাত। সে একদিন গেছে। বেরা আর রাজরায় খুন হয়ে গেল। যত পেটমোটা মানুষ সব পালাল। তাদের জমিতে তীরে জড়ানো নিশান। বিদ্যাধর যেয়ে আমাদের জমিতেও তীর ছুঁড়ে দিল। আমাকে টেনে নিয়ে দেখাচ্ছে যে, বৌঠান, তোমার জমিও গেল। আমি হাসছি।

—আপনি হাসলেন?

—ষোল বছর থেকে যার ঘরনী, তার জন্যে একে ধান দাও, ওকে চাল দাও, আজ এরা খাবে, কাল ওরা থাকবে,—আমাকে তো ষোল বছর থেকে শেখাত, কিছুই তোমার নয়, সবই সকলের। ভাইও দাদার মতো। হাসলাম। তখন সব অন্য রকম। সব ধান কেটে জাত করা হচ্ছে, এই বড় বড় উনোনে মেয়েরা রাঁধছি, পুরুষে মেয়েতে মাঠে বসে খাচ্ছে। ধান ভাগ হয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে। আমরা জানি এমন দিনই থাকবে। কে জানত বলো থাকবে না।

—আপনি স্ত্রীভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

—এক হাতে তালি বাজেনি হে ছেলে। আমি মোটা বুদ্ধির মানুষ আর যখন অনেক ছিল সেও সাত বিঘাই ছিল। সকলকে দেখতাম, বাইরে একরকম, অন্দরটা কেল্লার মতো আড়াল করা।

আমি ঘরটা আগে ঠিক করলাম, নইলে পারতাম না। ভাবভালবাসাও ছিল খুব। ও কালো বলে বরাবর বাসন্তী রঙের কাপড় পরাতাম।

সুজলা বলে, নাও, থামো! ও তো আমার কথা শুনতে আসেনি। তোমার কথা বলো।

—ও তপুর কথা জানতে চায় বউ।

—সে কোথায়!

—আমি যা জানি বলি।···দাঁড়াও একটু। নিচ থেকে আসি। তুমি যেয়ে শুয়ে পড় না বউ?

—তাই যাই। চোখ লেগে আসছে।

ওরা নেমে যায়। উঠে আসে একা সন্তোশ। বলে, বাইরে যেতে হলে ভিতরের উঠোনে। নেমো না কিন্তু।

—আপনার সাপের ভয় খুব।

—সাপ এখানে ঘটনা, কল্পনা নয়। ইঞ্জেকশানে ফল হয় জেনও মানুষ ওঝা-রোজা-গুনীন-বেদে করে। পর্বতের ছেলে মঙ্গল এখন ইঞ্জেকশান দিতে শিখেছে। ওষুধ মেলাই তো দুষ্কর। রাস্তাটার কথা আগে বলি, তাতেই বুঝবে। সেদিন যে সব জায়গায় আন্দোলন হয়, সে সব জায়গায় উন্নয়ন আসতে দেরি হয়ে চলেছে। আর আন্দোলনের ব্যাপার নয়, সাপের ইঞ্জেকশান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় অমিল। পর্বত লেগে আছে, তাতেই যা কিছু···

—হ্যাঁ, আমার কথা। নানচক স্কুলের শিক্ষক মহীদা···বড় দুঃখের কথা তার ছেলেটাই চাকরি নিয়ে চলে গেল গোহাটি, মাকে দেখে না। মহীদা অল্প রাজনীতি করত, বেয়াল্লিশে জেলে গেল। বেরোল যখন, কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। এ জেলায় কম্যুনিস্ট পার্টির একটা ব্যাপার ছিল, পার্টি ভাগের পরেও। যাক, পাথমারা থানায় মহীদাই হল নেতা। আমি তার অনুগত শিষ্য। উনষাট সালে খাদ্য আন্দোলনে আমি ষোল বছরের ছেলে। মহীদার সঙ্গে কৃষকদের নিয়ে গেলাম কলকাতা, আর বেদম মারই খেলাম। পার্টি

ভাগ হবার পরে মহীদা কিছুকাল লেগে ছিল। তারপর বলল, সত্যেশ! দেশ ভাগ, পার্টি ভাগ, ভাগাভাগি এখন চলবে। ক্রমে পার্টি ভেঙে আরো বেরোবে একই পার্টিতে নেতায় নেতায় দলাদলি হবে। আমরা কৃষকদের সঙ্গে যেমন থাকতাম তেমন থাকি, দেখা যাবে।

—তাই থাকলেন?

—থাকলাম। বিভক্ত আমরা চিরকালই, দেশের মানুষ। এ দেশে রাজনীতি মানেই ভাগের অঙ্ক। ভাগফলটা সবাই বাড়াতে চায়। একসময়ে ইংরেজ শত্রু, এই বোধ থেকে ঐক্যের একটা যেমন তেমন চেহারা ছিল। আর স্বাধীনতার পর, "কংগ্রেস শত্রু", এই ব্যাপারটা হয়তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ শক্ত একটা দলে পরিণত করেছিল। পার্টি ভাগ করে আমরা কি প্রমাণ করলাম বল তো?

—কি?

—আজকের দিন অবধি টেনে আনি হিসেব। আমি, জনৈক ফালতু সত্যেশ মাইতি, যে আছে বলেই কম লোক জানে, সেই বলছি। হিসেব টানি। দেখি, বরাবরই "ডিভাইডেড উই স্ট্যাণ্ড এবং ইউনাইটেড উই ফল।" ভারতের সর্বত্র এক চেহারা। এখন তো ভাগের অঙ্ক ভীষণই জটিল। মহীদা অঙ্কটা জানত।

—অঙ্ক শেখাতেন?

—মহীদা সহজে বাংলা, সহজে অঙ্ক শেখাবার একটা উপায় বের করেছিল। আমরা চাঁদা তুলে পাখমারায় চৈতন্য পাখিরার প্রেসে একশো কপি করে ছাপিয়েছিলাম। মহানন্দে সে বই ধরে বয়স্ক থেকে বালকদের পড়াতাম। মহীদা বলত, হিসেব না জেনে নিরক্ষর ওরা মরে।

—আপনার মাথা খুব পরিষ্কার।

নিরুত্তাপ প্রসন্নতায় সত্যেশ বলে, অবশ্যই। অবস্থার জন্যে পড়তে পারিনি। বিদ্যাধরকে সেজন্যেই কলকাতা পাঠাই। কলকাতা

থেকে সে ছেলে এল নতুন হয়ে। মহীদা, আমি, আমাদের নিয়ে বসল। সে সময়ের আগে থেকেই প্রত্যেকটা দলই মহীদাকে চাইছিল। মহীদার গণভিত্তি আছে। মহীদা যেখানে, সেখানে অন্যেরা তেমন সুড়ঙ্গ কাটতে পারে না। পরিণাম কি? কয়েক বছর ধরে সবগুলো দলই বলে "উনি আমাদের।" রাজরায়ও বলে।

—এ রকম কি সর্বত্র হয়?

—মোটেই না। দেখ দীপু! অপরে তোমাকে চশমা পরাবে। সে চশমা পোর না। মাথা সাফ রেখে খোলা চোখে দেখ। যারা বলে "উনি আমাদের", তারা বিদ্যাধরদের নামে "কি অপচয়" বলে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করত, এখন আর করে না। কিন্তু ভুলেও বলে না "বিদ্যাধর-লবণ-নাকফুড়ি-জোনাকি" এরা আমাদের। মজার ব্যাপার হল, এখন তো আন্দোলন বিষয়ে নানা বই। কোনো ইংরিজি বইয়ে বিদ্যাধরের নাম...জেলে মরেছিল, কলেজের ছাত্র, তাতেই তার নামটা ছিল মনে করি...তা ইংরিজি বইয়ে তার নাম দেখে এসে পাথমারা কলেজের গোপেশ কি উত্তেজিত। তার নাম ইংরিজি বইয়ে...জোনাকির নামটা খোয়া গেল ডামাডোলে। সাপে কেটে...মামুদপুর যায়...খুব একগুঁয়ে ছেলে ছিল। হাত পা দেখে বোঝা যেত বড়লোকের ছেলে।

—তারপর?

—তপুর নামটা করলাম না। সে জীবিত না মৃত না নিহত না নিখোঁজ, কোনোটাই প্রমাণ হয়নি। তাই ওর নামটা করি না। তবে জানুআরির শেষে আমরা একটা ছোট অনুষ্ঠানে তাদের স্মরণ করি, নিহতদের। নিহতদের...বিদ্যাধরকে তো জেলে মেরেই ফেলেছিল। আর অন্যরা...

—থামুন। টেপটা উলটে নিই।

—ওলটাও। এটা বেশ জিনিস। বিদেশের?

—অবশ্যই। এক বন্ধুর কাছে কেনা।

—তোমার বন্ধুরা খুব বিদেশ যায় ?

—এখন তো অনেকেই যায়। এটা এক বন্ধু, বেশ পাকা স্মাগলার, ফ্যান্সি মার্কেট থেকে এনে দিয়েছে।

—স্মাগলারও বন্ধু ?

—স্কুলের বন্ধু। মানুষ ভালো। চোরা কারবার লাইনে থেকে পয়সা করছে।

—ভালো না এ সব।

—না করলে পুলিশ ওকে ধরবে।

—ও। তুমি বিদেশে যাও নি ?

—না। নানচকেই আসিনি, বিদেশ! বলুন।

—ক্যাসেট এখন সবাই বাজায়। যাক…আন্দোলনের জায়গা এখানে তৈরিই ছিল। পর্বতরা আগে ক্ষেতমজুর আন্দোলন করেছে আমাদের সঙ্গে, কলকাতা গেছে খাদ্য আন্দোলনে…আর বেরা-রাজরায়-পাখিরা-এদের মতো লোকদের হাতে জমিও হারিয়েছে। দেশ স্বাধীন হতে জঙ্গলও কাটা পড়ল, এরাও মার খেল নিদারুণ। আর বেরা-রাজরায় ছিল বড় মহাজন। বলতে পারো আন্দোলনের ক্ষেত্রভূমি চাষ দেয়া ছিল।

—বীজ বোনার অপেক্ষা ?

—না।

সত্যেশ বড় সুন্দর হাসে।

—চাষবাসের তুমু কি বুঝ হে ? জমির এক লাঙ্গল দেয়া ছিল। মাটির ঢেলা ভাঙা, খানিক মাটি কাদাতলা করে বীজতলা করা, জল নামলে চারা নিয়ে রোহিন করা সবই বাকি ছিল। রোহিন আমরা করেছিলাম। একটা ফসল তুলেছিলাম। বরাবরের জন্যে পারিনি।

—কাকদ্বীপ-তেভাগার মতো।

—হ্যাঁ…ক্ষমতা দখলের সব লড়াইয়ের মতো।…মহাদা বলল, সত্যেশ! এটাই পথ হে! দেখ, কলকাতা থেকে ওরা এসেছিল

যেমন···তেমনি এমন একটা জায়গায় এসেছিল, যেখানে শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস জমির নামের মধ্যেই আছে। জে. এল. আর. ও. আপিসের রেকর্ড তো অলিখিত মহাভারত। কোনো জমিটার নাম লধা ডাঙা, কোনোটার নাম সরেণ চক, কোনোটার নাম মুড়া অর্থাৎ মুণ্ডা গেড়্যা। সে সব জায়গার বাইরে অন্য নাম। দখলদার আমাদের মতো ভদ্রলোকরা। একশো বছর আগেও কিছু হয়ে থাকবে। পর্বতরা বলে সিধুকানুর হুলের পরে এখানেও চকভানপুরের রাজার আমলে একটা হুল হয়েছিল। কবে হয়, কী হয়, সঠিক জানে না।

—তারপর? কত কী জানি না।

—জানতে চাইতে হয়। না জানা বড়ো অপরাধ হে। দণ্ডনীয় শাস্তি। না জানলে হবে কেন? হোক না কেন অতীতের কথা, হোক না কেন অপরের বিচারে ব্যর্থ সংগ্রাম···তা দীপুবাবু! আমাদের সাঁওতাল যুদ্ধ, কোল যুদ্ধ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, নানান কৃষক বিদ্রোহ, যা আজও ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বলে স্বীকার করা হয় না,—আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহ···কাকদ্বীপ··· তেলেঙ্গানা···ফলাফল বিচারে সব তাতেই পরাজয়। কিন্তু ইতিহাসে একদিন লিখতে হবে এগুলির মতো লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জয়ে গৌরব নেই,—সে পরাজয় অনেক মহান।

—হ্যাঁ···ওটাই ঠিক।···আপনি বলুন···আমি যেন দাদার কাছে যাচ্ছি···আপনি নিয়ে যাচ্ছেন···

—তাই?

—হ্যাঁ।

—ওরা এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। তপু ছিল আগাগোড়াই কুণ্ডলায়। আমরা সব ধরো কুণ্ডলা, তেঁতুলবেড়ে, সজিনা, কুমিরমারি, চকভানপুর, নানচক, এমন সব জায়গায় ছড়িয়ে আছি, সর্বদা চলাফেরায় আছি, পাখমারা থানা তখন তেমন বড় নয়। মহীদাকে

সবাই চেনে। তার বয়স তখন পঞ্চাশ বাহান্নই হবে। সে চরকির মতো ঘোরে, খবর পৌঁছয়, তারপর···

—খতম প্রোগ্রাম?

—না। হটচটকা হয়নি। রাজরায় আর বেরাকে দাবিপত্র দেয়া হয়, জমিজমা ছেড়ে চলে যাবার কথা বলা হয়, শেষ অবধি তাদের সঙ্গে রীতিমতো বিতণ্ডা। পর্বত যত বলে, বাবু বিশ বোল! বেরা তত চেঁচায়, পুলিশ আনা করাব সদর হতে, খড়্গপুর হতে, দিব তোদের মেরে। দীপু! গণ আদালতে রীতিমতো বিচার করে কৃষকরাই ওদের মারে। এবং পর্বতরা ওদের মারার কালে, এ কোপটা লধাডাঙা নিয়েছ, এ কোপটা মাঝিডাঙা, এটা সরেণ ডাঙার জন্যে, এ সব বলে বলে মেরেছিল। তারপর কিছু কাল···এখনো দেখতে পাচ্ছি যে পাকা ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ওরা আসছে কুলকুলি দিয়ে। এ কথা তো কেউ বলে না যে যারা মুলুক ছেড়ে চলে গেল তাদেরকে ওরা চলে যেতে দিয়েছিল?

—এমনিই?

—হ্যাঁ···পর্বতদের নীতিবিচার বোধ অন্যরকম···পর্বত সহজাত স্বভাব নেতা। ও আমাদের বলল, যারা অপরাধী, তারা নেই। ওদের আত্মীয়স্বজন দাঁতে খড় নিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে, পালাতে চাইছে। বলছে পুলিশকে বলব না। মহাজনী খাতা, জমির কাগজ সব জ্বলে গেছে। ওদের হাতিয়ারও কেড়ে নিলাম। পুরুষরা আঁধারে পলাল, মেয়েছেলে, ছোট ছেলেদের মারব? মহীদা বলল, আটকে রাখা উচিত ছিল বেটাছেলেদের। যা হোক, শেষ অবধি ওদের কথাই মানতে হল।

—সব পালিয়েছিল?

—স—ব। কিছুদিন সে কী আশ্চর্য শান্তি, ভাত-কাপড়-বাৎসরিক ধান, এ দিয়ে যাদেরকে ভাতুয়া করে বেঁধে রেখেছিল বেরা, সে সব সাঁওতালরাও আমাদের সঙ্গে···মুক্ত অঞ্চল হয়ে গিয়েছিল

পাখমারা থানা, মামুদপুর থানার খানিকটা। তারপর আক্রমণ আসতে থাকল।

—আগে কোথায়?

—আগে মামুদপুরে। ওখানে সাতজনকে গণবিচারে কাটা হয়। এ সময়ের কথা, যে গ্রাম থেকে ছেলেরা শহরে ফিরবে। মহীদা বলে গেল পালাও সন্তোশ। আমিও যাচ্ছি। চারদিকে খবর দাও। গা ঢাকা দিয়ে থাকব, ঘুরে ঘুরে আসব। আমার মনে হল, নানচকের ওপারে বালিমারিতে গোষ্ঠ মুর্মুর বাড়িতে আমাদের অনেক কাগজপত্র, হাতিয়ার, বাড়িও তার কেল্লার মতো বলতে গেলে।

—বালিমারির নাম শুনেছি।

—মহীদা বলল, যে যেখানে যা রেখেছ, কাগজ পোড়াও, হাতিয়ার রাখ। রণাঙ্গন তো ছাড়ব না হে। এখন ছড়াও, ছড়িয়ে পড়ো। পরেশ!

—খোঁচড়।

—হ্যাঁ। ভয়ানক মরমী, খুব সাহায্যকারী। তপুর সন্দেহ ছিল খুব। ও বলে গেল, পরেশকে ফলো করে চোখে রাখতে হবে। মহীদা যে চকভানপুরে যায়, তা পরেশ জানত। আমি গেলাম তার সাহায্যে। বিদ্যাধর, লবণ আর নাকফুড়ি ওই মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে বালিমারিতে গেল···

—গেল?

—গেল। ওখানে যা করবার তা করল। ফেরার সময়ে ওই মাঠে তাদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই···পরেশ সংবাদদাতা···তপু রাতে যেয়ে আমাদের খবর দেয়···পথে পাথর বেজে পায়ে খুব জখম··· আমাদের চলে আসতে বলে···ও মহীদাকে বলল, পরেশ খোঁচড়! কিন্তু আমরা তখন টার্গেট। তপু কী ভাবে চলে আসে জানি না। পুলিশ আমাদের ঘেরল। মহীদা বলে নো সারেণ্ডার! দারোগা

বলে, থানায় চলুন। মহীদা বলে, এদের উপর হামলা করবে না। এরা জানে না কিছু। ওঃ, ফণীরাজ সরেণের বউ কুলকুলি দিচ্ছে, মহীবাবুকে পুলিশ ধরল গো! আর কালো কালো মানুষ আগাচ্ছে। মহীদা বলল, তোরাদের কী? আমাকে ধরছে ধরতে দে। আমাকে নিচু গলায় বলে, সাঁওতালীতে বোঝাও সত্যেশ। জীপের পর জীপ আসছে। মেরে দেবে মেয়েছেলে, শিশু। তা আমি বললাম, তোরা যে করে পারিস ধান-জান বাঁচা। আর মহীদা!

—কী?

—আগাচ্ছে আর বলছে, ইংরেজ জেল খাটিয়েছে, কংগ্রেস জেল খাটিয়েছে, এ জমানাতেও জেল!—বলে দারোগার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বন্দুক কেড়ে নিব।

—তারপর?

—মহীদা গুলি খায়, আমার পায়ে লাগে। মাথাতেও মারে। থানায় যখন জ্ঞান হল, শুনলাম মহীদা মরে গেছে। শুধু ভাবছি, তপু ঠিক বলেছিল, পরেশ!

—তারপর?

—আমি জেলে। বিদ্যাধর জেলে যাবার পরেই নিহত। পরে জেনেছি, তপু যায়নি গ্রাম ছেড়ে। এ সব ঘটনার দিন পনেরো বাদে, সর্বত্র যখন পুলিশ থিকথিক করছে, অত্যাচার চলেছে, মাঠে ঘটি নিয়ে গেল পরেশ, তার ধড় মুণ্ডু ফাঁক। পুলিশ অসম্ভব ধোঁকা খায়। কেন না পুরুষ বলতে কেউ নেই। মেয়েছেলে আর বাচ্চা…ঘর জ্বলে গেছে, গরু, ধান, শুওর, মুরগি, ছাগল স—ব হাপিস পুলিশের হাতে।

—দাদা?

—আমি আর জানি না।

—পর্বতের কী হয়?

—পর্বত চকভানপুরে অনন্ত খাটুয়া গোবিন্দর বাড়ি বসে গরু

সারাচ্ছিল। ও যে সেখানে ছিল, সে সাক্ষ্য এতজন দেয়, যে পুলিশও ঘোল খায়। মণ্ডল তো পালিয়েছিল। কুণ্ডলাতে পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও পরেশের হত্যার সঙ্গে পর্বত তপুকে জড়াতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল। শেষে মঙ্গলীরা দল বেঁধে থানায় এসে দারোগাকে, অশোক চ্যাটার্জিকে ঘেরল।

—কেন?

—এটা একটা মহাকাব্য। একশো চারটি আদিবাসী, অ-আদিবাসী পাঁচটি, সব মেয়েছেলে,—সবাই বলে আমাকে ধর বাবু, আমি মেরেছি। কেমন করে মারলি? বলে, ওটার তো আমাদের মেয়েছেলের লালচ খুব। খুব নষ্টামি করত। তা যুবতি মেয়েরা ওকে লোভাল, মাঠে আনল, আমরা যেয়ে কাটলাম।

—আশ্চর্য!

—এ বলে আমি কেটেছি, ও বলে আমি। কে বলে, টাঙ্গি মারলাম, কে বলে দা মারলাম, কে বলে হেঁসো দিয়ে কাটলাম। পুলিশ সকলকে একদিন একরাত বসিয়ে রাখল। তারপর ভ্যানে তুলে দূরে দূরে ছেড়ে দিয়ে নাকাল করল।

—দাদা?

—কেউ কিছু জানে না। আমি যা জানি, পাথমারা থানার রিপোর্টে, পরেশ দত্তকে কে বা কাহারা একটি শাণিত ভারি অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করে। মৃতদেহের পোজিশান দেখে মনে হয় পিছন থেকে মারা।

—দাদা?

—বিজয় ওরফে কান্ত ওরফে তপু বা তপোব্রত দত্ত নিখোঁজ। পরেশের হত্যার অনেক আগেই সে চলে যায়। কিন্তু গ্রেপ্তার সে হয়নি। বোধহয় ফাইল জ্যান্ত বা লাইভ আছে।

—পর্বত কিছু বলেনি?

—কিচ্ছু না।

—ও কী জানে ?

—ও বলবে।

—আমাকে নিয়ে যাবেন ?

—অবশ্যই। মহীদার বউ, বউদির খুব দুর্গতি। বাড়ি ভেঙে পড়ছে···ঠোঙা তৈরি করেন, ইস্কুলে মেয়ে পৌঁছন। ছেলেটা···

—আর কে কে ?

—পর্বতকে বলে দেব। সে অন্যদের ডাকবে। পচা আছে, সাজো আছে। সনা এখন মণ্ডলের বউ। আর রাজোমণি বাপের ঘরের পাশেই···ও আর বিয়ে করল না। ও জাত "বাং" অর্থাৎ "না" বললে তাকে "হ্যাঁ" করানো কঠিন। আছে, বাপের কাছেই আছে।

—পর্বতের আশ্রয়ে।

—পর্বত যথেষ্ট চমকে দেবে। আজ সেদিন নেই। কিন্তু ভেব না যে ছবিটা সম্পূর্ণ নেগেটিভ। ওই বিলের কথা বললাম না ? আমরা কয়েক গ্রাম মিলে এখানে···থাক, সে সব পর্বত বলবে।

—অন্য সব গ্রাম ?

—সব দেখিয়ে দেবে ও।

—আপনি ?

—আমিও থাকব। আর নয়, এবার শুয়ে পড়। সকাল হল বলে।

—রাত কাবার হয়ে গেল ?

—হবে না ?

সত্যেশ নিমেষে ঘুমোয়।

আর তপু, বাবার তপোব্রত, মায়ের তপু, দীপুর দাদা, ষোল বছরের অন্ধকার পর্দা যেন সরাতে সরাতে দীপুর কাছে আসতে থাকে।

দীপু বুঝতে পারে, দাদাকে ও প্রথম জানছে, আর এই দাদাকে ওর মা, দিদি, চেনে না।

দাদা কী কাউকে ভালবেসেছিল ?

কোনো মেয়েকে ?

সে সব আর জানা যাবে না।

বৃষ্টি ঢেলে ঢেলে আকাশ ঘুমোতে যায়।

দীপুও ঘুমিয়ে পড়ে।

পর্বত সাঁওতাল ও দীপু

তেঁতুলবেড়িয়া বা তেঁতুলবেড়ে থেকে কুণ্ডলা যাবার পথটি গেছে ঘুরে ঘুরে। সজিনা খালের পারে কুণ্ডলা, সজিনা, দু-পাশে শস্যক্ষেত্রে সবুজ শ্যামলিমা। এ সব জায়গায় একদিন বাঁকে বহে, গরুর গাড়ি করে ধান এসেছিল ঘরে ঘরে। ধান আর জান বাঁচাতে বলেছিল মহাঁদা, কিন্তু ধানের গতি বড় সর্পিল। সাপ যেমন বিবর খোঁজে, অঘ্রানের ধানও চলে যায় বেনাম জোতদারের ঘরে। এ সব জমির কিছু এদের দখলে আছে, সামান্যই।

সত্যেশ জানিয়ে রেখেছিল, আর পায়ে পায়ে তপুর কাছে যেতে যেতে দীপুর বুকে সমুদ্র ভাঙছিল। সত্যেশ ওর হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? কে বলেছিল, গ্রাম ছেড়ে যাব না ? পুলিশ যখন গ্রামের বুকে চুল চিরে তল্লাসী চালাচ্ছে ?

এত গাছ ?

সজিনা খালের দুদিকে গাছের পর গাছ। বাবলা, জাম, শিমুল। গাছগুলি তেমন বড় নয়।

পর্বত সাঁওতাল কপালে হাত রেখে চেয়েছিল সাঁকোর ওপারে দাঁড়িয়ে।

—কী রকম বুঝ মাইতি ? পেরাতে পারবে ?

—না হে পর্বত ! নৌকা হয়ে এস, তোমার কোলে চেপে যাব। সাবধান দীপু !

—সাঁকো হিলাব?

—গিদরা হই গিছ?

—হাঁ গো মাইতি!

পর্বতের দেহ, ব্যক্তিত্ব সবই বিশাল। কোকড়া ছোট চুলে পাক লেগেছে। ধুতি হেঁটো, খালি গা।

ওরা সাঁকো পেরোয়

—দাদা কী সাঁকো পেরোত?

—তখন ওদিকে ছিল।

পর্বতের চোখ বড়ো তীক্ষ্ণ, বড়ো মর্মভেদী।

—তপুর ভাই।

—এ তো গিদরাটা।

—তার চেয়ে বছর দশেকের ছোট।

—তপুর ভাব নাই মুখে।

—দাদা অন্যরকম দেখতে।

—কুথা তপুর ভাই?

এ বয়সেও বলিষ্ঠ ও সক্ষম যে মহিলা এগিয়ে আসে, সে মঙ্গলা। এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়।

—মাইতি তো কুণ্ডলার পথ ভুলেছে।

—তুমি বা তেঁতুলবেড়ে যাও কবে?

—আজই তো যাব, না কী কাল?

পর্বত বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে। বলে, কাল। লাও, জল আনো। বিটিরা কোথা?

পর্বতের ঘরের সামনে, একটু দূরে সেই তেঁতুল গাছটি। তার পাশে একটি অচেনা গাছ।

—ওটা কী গাছ?

—অর্জুন গাছ। লতাটি দেখ হে। সনা গাছে লতায় বিহা করিয়ে দিল যে মাইতি।

গাছটি জড়িয়ে যে লতা উঠেছে সেটিও অচেনা।

—উটি হাড়ভাঙা লতা গো! অষুদে লাগে অর্জুন···ওই লতা! মাইতি দাঁড়াও খ্যানেক।

—আমাকেও পা ধোয়াবে?

—অতিথ আনলে যে!

ওরা দাঁড়ায় পিঁড়িতে। তুটি মেয়ে এগিয়ে আসে হাতে জলের ঘটি।

—দীপু, এটা নিয়ম। "না -না" কোর না।

তুটি রঙিন ডুরে, জামা পরা হাস্যমুখী কিশোরী ওদের হাঁটু থেকে পা ধোয়ায়, মোছায়। এবারে হাঁটু থেকে নিচে তেল হাত বোলায়। আবার জল ঢালে, মোছায়। তারপর এক গেলাস জল ধরে।

—জলটি খাও দীপু। জল খেলে, এবার তুমি অতিথি হয়ে ঘরে যাবার অধিকার পেলে।

ওরা এগোয়, দাওয়ায় ওঠে।

দীপুকে স্বপ্নে পেয়েছে

—এ ঘর···

—তখন গেল, পুলিশ ভাঙল। বানের বছরে সজিনা ভাসাল। সেই ভিটা উঁচু করে নূতন ঘর···

—আর গোয়ালটা?

পর্বত বলে, গোয়াল পিছনেই। সবই নূতন।

—তখনকার কিছু নেই?

—আমরা আছি। গাছটা আছে। সজিনা খাল আছে। কত মানুষ আছি। পুলিশ সব নাহাশ করতে পারে না, বান পারে না সব ভাসাতে, সবই আছে।

মঙ্গলী তুধ ছাড়া চা আনে, মুড়ি।

—তপুর ভাই! নাম কী?

—দীপু।

—তপু তোমার কথা বলে যায় নাই। ঘরের কথা বলে যায় নাই। ার রংও কালো ছিল, আমার ঘরই তার ঘর। সে তো বিশ বলেছিল হ, সাচাই বলেছিল।

—সে কোথায়?

—এই দেখ! তার সাঁজান করে সবাই, আমাদের বলে। আমি লি তোমরা খুঁজ। খুঁজে দেখ সে কোথা গেল। মাইতিও াজাত, এখন আর সাঁজায় না। কী মাইতি! সম্বাদ জান? ান নাই?

—কী সম্বাদ?

—নলিনের বউটা। সকালে হাসপাতালে লাড়হাই করে ারে ঢুকালাম, গ্যাস দিয়া করালাম, আর নলিনরে গদাগদ পটালাম।

—অপরাধ?

—ঘরে এসে দেখে ভাত হয় নাই তো উনানে লাথ। বউটার া পেট পুড়ল। বেটা হাসপাতালে নেয় না, যদি সে কথা ফাঁস হয়, রে না কী ধরবে। আমি বললাম, শালো! ঘরে পচে মরে যেত তা তোরে আমি ওর সঙ্গে দিতাম! লধা তো! জেল পুলিশে রায়।

—কুন্দ বাঁচবে তো?

—না বাঁচলে হাসপাতাল ঘেরব।

—এরা সব কোথা?

—আসবে, সাঁঝে আসবে। কই রে বাসো চাম্পা! এই দেখ ছলা। দুটাই আমার লাতিন লাগে। রাজোমণির বিটি হয়। াসো এখন আট ক্লাসে, চাম্পা ছয় ক্লাসে।

—কোন স্কুলে?

—দেখবে হে! সজিনায় আদিবাসী ইস্কুল, লধা আশ্রম, বডিং আছে ছেলাদের, মেয়েদের বডিং আছে, চালু হয় নাই এখনো। দশ

বছরের লাড়হাই হে! পর্বতরা বসে যায় নাই। ওরা তো ভেবেছিল কমর ভাঙি গিছে।

মঙ্গলী বলে, ভাঙছিল তো কমর।

—হঁা। হাসপাতালে কত কীর্তি করল। হাড়ভাঙা লতা থাকলে···তা ছেলা, অযুধপালার বাড়ি (চাষ/ক্ষেত) করে দিছি। মণ্ডলটা অষুদ করে। নিবারণ ভক্তা ভাল কবিরাজ হে! ছিল আমার কাকা ধনীরাম সানতাল। সে তো মরি গিছে।

দীপু স্তব্ধ হয়ে থাকে। পর্বতের বাড়িতে এক চালে তিনটি ঘর। ঘরের দেয়ালে গোলা রঙে লতা পাখি ফুল আঁকা। এত পরিষ্কার সব, যেন সিঁদুর কুড়িয়ে নেয়া যায়। দেখে মনে হয় না এখানে একদিন প্রলয় ঘটে গেছে।

মঙ্গলী ওর মনের কথা বোঝে।

—ছেলে বউ এক ঘরে, আমরা দুঘরে। ওইটা বিটির বাড়ি গো ছেলা! তুমি লবণ কেন, মণ্ডল হতেও ছোট। নামটি কী বেশ বললে?

—দীপু।

—মাইতি! বিয়া বুঝি লাগে। আমাদের চাঁদ গো! বাসোরে মনে ধরে গেল যে?

সত্যেশ বলে, বাসো পাশটা করুক।

পর্বত বলে, হঁা হঁা। পাশ দিক, দিদিমণি হোক, লিখাপড়া জানি নাই বলে তো মরি।

সত্যেশ বলে, রাজো আর সনা?

—ঘাস আনতে গিছে।

—ঘাসের বোঝায় সাপ আনল সেদিন।

মঙ্গলী মাথা নাড়ে, কালসাপের ক্যারা গো! মাথায় দংশাত যদি!

পর্বত বলে, অরা শুনে কথা? বোঝা বাঁধলি তো তখনি লাঠিপিটা

কর্। সাপের আবাদ খুব! জান মাইতি! কালও ধুরাটারে দিলাম খানিক। সাপ মারবি, চামড়া বেচবি, ইঁদুরের বংশ বড় হবে না? তপু মাটিতে ছবি এঁকে বুঝায়ে গিছে, পিথিমিতে, ই ধারত্তিতে সকল প্রাণীর দরকার আছে। কত কথা!

দীপু অস্ফুটে বলে, পড়াত?

—পড়ায়েছে। যা জান। দরকার সব বুঝায়েছে। সে আমার মাস্টর, আমি তার মাস্টর। আমি ধান-জল-মেঘের গতি-অষুদপালা বুঝায়েছি। সময় বা পেতাম কুথা? এই মাইতি, আর মহীবাবু, পর্বত! পর্বত! সর্ব্বদা।

সত্যেশ বলে, চল হে পর্বত, ওকে ঘুরাই।

—ফিরবে?

—তোমার ঘরে থাকবে।...তখনকার সব কথা লিখবে, চোখে দেখছে, কানে শুনছে।

পর্বত ভেতর থেকে শান্ত হয়ে যায়।

—মাইতি। বিশ বোলে, না ঝুটা? সারি না এড়ে? শহরের ছেলাদের আমি...সোম এল, তা জীপ হতে নামল নাই? কুথা গেল তারা?

—না পর্বত, আমি বলছি।

পর্বত নিঃশ্বাস টানে, ফেলে।

—আমাদের তো একোই কথা ছেলা। ধান্দাইমান্দাই বুঝি না। বলি, বাবু বিশ বোল! কে বলে বলো? মেয়েছেলাদের বডিংটো লিয়ে কম দৌড়ালাম? ওই পার্টি দেখায় নিসপেকটার, সে দেখায় বি. ডি. ও. পঞ্চায়েতে প্যাঁচ মারে। ইবার মঞ্জুর না করলে...সবাই বুঝে ভোট! পর্বত আমাদের সঙ্গে এস, সব করি দিব। তা আমি বলি, অনেক করলি তোরা। অনেক...

—করেছে কিছু?

—অনেক। জমিজমা ভূয়া আদিবাসী নামে কিনে, টাইবেল

আপিস লড়তে জানে না, ভরা পোয়াতি যেমন! বসে থাকে। লয় তো পথ নাই, কাম নাই, ছেলা মেয়া ইস্কুলে যাবে তো সীট নাই, অনেক কন্নল।

ঈষৎ হাসে পর্বত।

—সে লাড়হাইয়ে তো ছল উঠে যেত। তখন ভাবতাম, এ হতে মন্দ দিন হবে নাই। দিনে দিনে, কী বুঝ মাইতি? দিন আরো মন্দ, কিন্তুক লাড়হাই নাই।

—সে লড়াই নেই পর্বত।

—আছে, তবু আছে। লাড়হাই নাই তো বেঁচে আছি কেমনে? চল হে ছেলা···

—আমার নাম দীপু।

—দীপু বলতে জিভ সরে না। আমারই বুনের লাত্তিটো দীপু নাম তার। খুব রং বাজি, খুব প্যাণ্ট জামার বাহার, কানে রেডিও বাঁধি ঘুরে। তুই গ্রামের ছেলা, এমন হলে চলে? ট্রাকের কাজে দেশে দেশে ঘুরে, ছেলাটো আর সি ছেলা নাই।

—ওর কী দোষ বল? তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকেই লরির হেল্‌পার।

—শুধু পলাত। আজ হেথা, কাল হোথা!

দীপু আস্তে বলে, যা ইচ্ছে ডাকবেন।

—নাঃ! দীপুই বলব। তপুও "দীপু" ডেকে গিছে?

দীপু মাথা হেলায়। এখানে ওর দাদা আরো বাস্তব, আরো শরীরী।

—আমি ছোট অনেক···এক সময়ে ফড়িং বলত, এক সময়ে "বীরপুরুষ" বলত, একটা কবিতা বলতাম "বীরপুরুষ"···তারপর দীপুই বলত···দেখুন, ঘর ছাড়ার আগেই দাদা মনে মনে ঘর ছেড়েছিল। আমাদের কারো সঙ্গেই তেমন কথা বলত না অনেকদিন।

পর্বত মাথা হেলায়, সত্যেশও।

ওরা তো জানে, জানবে।

দীপুদের চেয়ে বেশি জানে।

পর্বত নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমরা ঘুরে আসি রাজোর মা!

—এসে খাবে তো?

—তুই দিলে খাব, লয় সজিনা খালে জল আছে। চল গো মাইতি।

চলতে চলতে পর্বত বলে, বিকালেই আসুক সবাই। এখন জল··· এখন মাঠে কাজ···

দীপু বলে, আপনাদের জমি আছে?

—এ সকল ভেস্ জমি। চাষ আমরা করি। পাট্টা দখল দিলে আমাদেরি দিতে হবে। দিতে পারে। আমারে একা দিতে চায়, তা তো নিব না।

—কতটা করে?

—খানিক খানিক। আমার বুঝি দেড় বিঘা, তা দু বিঘার উপর নাই। মাইতি জানে, সকলই ছিল পতিত। খাল তো মজে গিছিল। খাল খুলা হল তো জমিও হাসল। আর মানুষের বসত, জমি কিনা ···কিছু বিস্তর কাম পঞ্চায়েতেও মিলে, এমনি···চল খয়েরপুর যাই। ওই, ওই দেখ ঘর। সব নয়া বসত হে! নাকফুড়ির ঘর ছিল। হেই রাজো!

দুটি রমনী মাথায় ঘাসের বোঝা আনছে। খুবই বড়ো বোঝা। কপাল ঢেকে গেছে প্রায়। খাটো করে নিয়েছে কাপড়। ঘাসের বোঝায় গোঁজা হেঁসো।

রাজো এবং সনা চলা থামায় না।

—কত দেরি করিস?

রাজো চলতেই থাকে ও সহাস্য জবাব দেয়, ঘড়ি কোথা যে টাইম জানব?

—দাঁড়া।

ওরা দাঁড়ায়।

সনার নিশ্চয় বছর তিরিশ হবে, রাজো তার চেয়ে বড়ো। মুখ দেখে বোঝা যায় না।

—এটা বিটি। এটা বিটি ছিল, বেটার বউ হল। এই ছেলা দীপু।

মেয়ে ছুটি সপ্রশ্ন।

—তপুর ভাই, ঘর যা!

রাজো নিঃশ্বাস টানে, গলায় বিস্ময়ের শব্দ।

—যা, ঘর যা।

রাজো তবু চেয়ে থাকে। দীপু বুঝতে পারে রাজো চেয়ে আছে। থাকবেই, একদিন নাকফুড়ি, তপু, লবণ, সোম, নবেন্দু, সন্তোশ, রাণা, বিলু, বিত্থাধর, পচা সিং, ভূমিজ, সাজো সিং মুণ্ডা, রাজোমণি, মঙ্গলী, সুজলা সবলের জীবন বহে এসে মিশেছিল সজিনা খালে। আবার মূল স্রোত থেকে কত ধারা কত দিকে। তবু তো জীবন চলে। রাজোরা সতেজ সবুজ ঘাস কাটে, সন্তোশ চাষাবাদ করে, দোকানে যায়, পর্বত অবুদপালার আবাদ করে। দৈনন্দিনতা মানুষকে বাঁচায়।

—দাঁড়াও খ্যানেক।

ওরা দাঁড়ায় একটি ক্ষেতের পাশে।

—মাইতি!

—হ্যাঁ পর্বত!

ধানক্ষেত যদি বা আলে বাঁধা, ওপারে তো অপার আকাশ। পর্বত চোখ মেলে দেয়, কুঁচকে যায় কপাল।

—যা ছিল তা নাই। জোত খানিক গিছে। এ সকল বেরার জমি গো ছেলা। এইখানে লবণ তীরটো পুতি দেয়, সেই পরথম। তা বাদে জমিনে জমিনে তীর…

তীরের উদ্যত আকাশমুখী ফলাই ছিল সেদিন নিশান। জমি আমার, বলছিল তীরে বাঁধা লাল নেকড়া। একদা, অতীত···একদা, অতীতে···এখনো এখানে তপু।

—চল চল।

কাল রাতে জল হয়েছিল। ধান ক্ষেতে কল কল জল বায়। আকাশ এখন মেঘ মলিন। পর্বত বলে, কুয়া বিল পুষকর্নী ভরে নাই, আরো ঢালো হে আকাশ!

সত্যেশ বলে, এখনি নয়।

—তা কেন? ছেলাটা ভিজুক খানিক?

কিন্তু বৃষ্টি হয় না।

—ডাইনে ঘুর, ডাইনে ঘুর।

সতোশ বলে, ঘুরে ফিরে খয়েরপুর।

—লয় কেন? গরুটো লিয়ে এ পথেই তো আমি···ঝুড় ঝুড় ঝোপজঙ্গল ছিল, আর ওই যে ঘর! আমার বুনের ঘর। হোথা এসে আমাদের বৈঠক হত। মিটিন কী! কত কথা!

পর্বত মাথা নাড়ে।

—লবণটো তার মায়েরেও টানত। মণ্ডলরে লয়ে ভয় ছিল, হটচটকা রাগ। লবণ আমার জলের মতো ঠাণ্ডা গো! কত রাগ করছি তার উপর। লবণ, নাকফুড়ি, মুখে কথা নাই···তারাই দেখ সেইদিন···

ওরা চলতে থাকে।

সত্যেশ বলে, এ সব জায়গায় জমি দখলের লড়াই হয়েছিল··· আমরা খয়েরপুর বলি···কিন্তু মদনচক বাড়তে বাড়তে খয়েরপুর গ্রাস করেছে।

পর্বত বলে, সাথুয়া বাবুর বন্দুক ছিল। বাবুদের ঘরে ঘরে বন্দুক, ঘরে ঘরে লাঠিাল। কিন্তুক···বন্দুক রাখতে পারে নাই··· জমির দখলও ছাড়ি পলাতে হয়···

—আবার খাল পাড়ে এলাম ?

পর্বত দীপুর দিকে চায়।

—শোঁসান ছিল আমাদের…যেথা খুঁটা দেখ, হোথা লবন…নাকফুড়ি…মহীবাবুরে পাখমারায় জ্বালাল…পুলিশ লাশ ছাড়ে নাই। পুলিশই জ্বালায়।

—এখন…শ্মশান…নেই!

—না…গ্রাম বসত বড় এখন…শোসান সরি গিছে।

পর্বত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লবন…নাকফুড়ি…সে সব লাশ যেখানে একদিন…সেখানে এখন জল, শুধু জল। খাল বড় হয়েছে। খোঁটাটি বোধ হয় জল কত হল, মাপার জন্যে।

দীপু ওদের দিকে তাকায়।

—দাদা ?

পর্বত ঘুরে দাঁড়ায়। দু'হাত মেলে ধরে।

—আমার হাতের মুঠায় নাই…কোথা চলি গিছে কে জানে…সাঁজান কর। সাঁজান কর।

হঠাৎ ও গর্জে ওঠে।

—এতকাল বাদে তার সাঁজান কেন ?

—পর্বত!

—মাইতি, এ তুমার আমার কথা লয় হে! ভাই, মানলম। কিন্তুক বিশ বলুক ও, কেন ও ভাইরে সাঁজায় এতকাল বাদে ?

দীপু দু'হাত মুঠো করে।

—কেন না, ষোল বছর সে আমার কাছে নেই। আমি জানি না। জানি না তাকে। আপনারা জানতেন। তাই আপনাদের কাছে এসেছি। এখান থেকে সবাই গেল। সে যায়নি। কতজন মারা গেল। সে মরেছে বলে পুলিশও বলে না। অন্য কোথাও গেছে ? কোনো খোঁজ নেই কেন ? সোমদা…

—কি বলে সোম ?

দীপু পর্বতের চোখে চোখ রাখে। আকাশ, প্রবহমান খাল, ঘরদোরের পশ্চাৎপটে পর্বত বড় আদিম। সব সাঁওতালের ব্যক্তিত্বে এই আদিমতা কি থাকে?

—সোম কি বলে?

পর্বত এখন কৃষ্ণ ভারতের আদিম অধিবাসীদের প্রতিভূ। বহিরাগত দীপু তার সব নেবার পরেও তার গোপনতম যা, তা কেড়ে নিতে চায়। পর্বতের চোখ যন্ত্রণার্ত, ক্রুদ্ধ। পর্বতের চোখে অবিশ্বাস। কতশত বছর ধরে যারা শুধু নিজ বাসভূমে আজ পরবাসী, কাল যাযাবর,—বাসভূমে আজ পরবাসী, কাল যাযাবর—যারা দখল হারাতে হারাতে আজ নিঃস্ব প্রায় যাদের জীবনে আজও অন্ধকার। তাদের সকলের হয়ে পর্বত বলে, সোম কি বলে?

—সোমদারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে…আপনার গোহালে দাদা বসেছিল…এক পায়ে জখম…এক পায়ে জখম…দাদা বলেছিল, আমরা চলে যাব, ওরা? আমি গ্রাম ছেড়ে যাব না।

—আবার বোল্।

—বলেছিল…আমি গ্রাম ছেড়ে যাব না।

পর্বত ধীরে ধীরে প্রাচীন হয়ে যায়, যেন পাথর, যেন মাটি।

তারপর ওর মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

—তাহলে আমাকে সাথে নাও ছেলা। দুজনেই সাঁজান করি। কি বল মাইতি?

সত্যেশ মাথা নাড়ে।

—দীপু আর তুমি, পর্বত।

—তা বললে হয়?

—কালকের কাজটা হয়ে যাক।

পর্বত মুখ তোলে।

—দোষ নিও না ছেলা। ভগনাদিহি হতে আমার বলে

আসতেছি, "বাবু! বিশ বোল্।" সকলে তো বিশ বলে না। তাতেই ই শেঁাসানে দাঁড়িয়ে কথা যাচালাম।

—দোষ!

দীপু বিষণ্ণ হাসে।

—বিশ্বাস করবেন, এমন আশা করাই···সে সব আমি জানি। কিন্তু সে সব কথার শুরু তো অনেক আগে···

সত্যেশ বেশ অন্যরকম গলায় বলে, ভারতের আদিবাসী সমাজের ইতিহাস অন্য কথা পর্বত। দীপু তোমার কাছে এসেছে। তুমি বললে বলবে, না বললে "না" বলে দেবে। মাঝে মাঝেই যে চেতে ওঠো, এ ছেলেটা কি দোষ করেছে।

পর্বত শুভ্র হাসে। হাসিটি শুভ্র। দাঁতে পান বা গুড়াখুর কল্যাণে লালচে ছোপ।

—মাইতি! পর্বত চেতে ওঠে, তুমি থামা দাও, সে তো অনেক পুরানা দিন হতে হয়ে আসছে লয়? ছেলা! মনে দুঃখ কর না হে! পায়ে জল দিয়ে ছামুতে বসাই যারে, সে হয় বিশ্বাসের লোক।

দীপু হঠাৎ বলে, ওদের পায়ে জল দিয়েছিলেন?

—এই দেখ! কমরেটের পায়ে কমরেট জল দেয়? ত্যাখন আমরা সবাই কমরেট!

দীপু অতিথি, তারা ছিল কমরেট। একটি তফাৎ থেকেই যাবে দীপু, দুঃখ তুমি যতই পাও।

সত্যেশ চারদিকে তাকায়।

—সাঁকো, সাঁকো, সাঁকো। পাকা পুল কবে হবে?

পর্বত আশ্বাস দিয়ে বলে, হই যাবে। গণ দরখাস্ত লিয়ে যেয়ে যেয়ে মাটি বতর করে এসেছি, লয়—আবার ভোট আসে, লয়? ঘেরাও, বসি যাব, ইঞ্জিনারটারে আসতে দাও। পাখমারা থানা হতে নামচক হয়ে লয় কলকাতা যাব। তুমু আগে যাবে গো মাইতি!

সত্যেশ বলে, চলো।

—কি দেখ?

—কাল এখানে কোথায়… ?

—খয়েরপুর বুঝবে। সব আমরা ভাবি কেন?

পর্বতের ঘরে বিকেলে ওরা এসেছিল।

কিছু ছিল নাম, শুধু নাম। এখন তারা মানুষ। সাজো সিং মুণ্ডা বলে, চাটাই দাও গো মেঝান।

মঙ্গলী ঝামরে বলে, লিজে লাও কেন?

ওরা নিজেরাই পেতে নেয় খেজুর পাতার ঘরে বোনা চাটাই। দাওয়াতে বসতে হয়। জল আসতে পারে।

পর্বত সংক্ষেপে বলে। তপুর ভাই দীপু। বইলেখা করবে, সব দেখতে এসেছে।

পচা সিং ভূমিজ, সাজো সিং মুণ্ডা, পর্বতের ছেলে মঙ্গল, রাজো, সনা, সবাই বড় অভিনিবেশে দেখো দীপুকে।

পচার বয়স বেশি। ধূসর চোখ তুলে বলে, কাঁদলি কেনে রাজো?

মঙ্গল বলে, সারাদিন কান্‌ল।

রাজোমণি কথা বলে না।

সাজো সিং বলে, তার মুখ লয়।

মঙ্গলী বলে, মঙ্গলে রাজোতে কি বা মিল? সবার মুখে মুখে কি মিলে?

সত্যেশ বলে, মাস্টার কোথা?

—কিসের মাস্টার?

—প্রাইমারির মাস্টার। লক্ষ্মণ হেমব্রম।

এ সময়ে এক ক্ষিপ্রগতি বৃদ্ধ দ্রুত পায়ে ঢোকে, সঙ্গে এক যুবক।

—পর্বত এক জুতের মানুষ হে! অনন্ত খাটুয়ার কথাই মনে

থাকে না। মণ্ডল বলল মাস্টারকে। মাস্টার বলল আমাকে। তা মাস্টার না আসলে আসতে পারি?'

অনন্ত খাটুয়া চারদিকে তাকায়।

—এ তপুর ভাই?

—আজ্ঞে। আমার নাম দীপু।

—আমি অনন্তমহন খাটুয়া।

—জানি। কুমিরমারিতে পশুচিকিৎসক।

পর্বত বলে, এখন তো ভেট লিখ।

সত্যেশ বলে। অনন্ত কাকা ছাড়া আমাদের গতি নেই দীপু। মহিষ-গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-এমন কি শুওর অবধি কাকার চিকিৎসায় ভাল থাকে। গ্রামদেশে পশুর ডাক্তার বা কোথা, সাপের ডাক্তার বা কোথা।

অনন্ত বলে, ইনি তো নকশালী করে না।

—না, বই লেখে।

—বাপ রে তখন পর্বত!

অনন্ত মাথা নাড়ে।

—পর্বত আমাকে তখন…

—হেই খাটুয়া! আমি তোমায় কম রোগী দিই? খাটুয়ার অনেক, জানলে ছেলা? ইট পুড়িয়ে দালান দিল। সেবার কি পূজা করলে যেমন?

—এ পূজা নয়! সত্যনারায়ণ দিলাম।

—ছেলেরা তো মানপত্তরও দিল।

অনন্ত হাতের তালু চিত করল।

—শহরে যা হবে, হেথা তা হতে হবে। সে যা হাসির কথা! ক্লাবের ছেলেরা গুণীজনো সংবোর্ধনা দিবে। গুণী কোথা পায়? মাইতি অদেরে বুঝাল, ঘর ফেলে বাইরে খুঁজ কেন? খাটুয়া কমগুণী? গরু-ছাগল নির্ভর জীবন। সেই তো বাঁচায়। তা দিল সংবোর্ধনা।

—আর তুমি কের্তন গাইলা।

—বক্তিতা তো জানি না, তা সুরভিমঙ্গল গেয়ে দিলাম। কি! মন্দ করেছি?

সত্যেশ বলে, মাস্টারকে আমরা বৃক্ষবীর বলে মানপত্র দেব। মাস্টার ওলচিকি শেখায়, ইস্কুলে পড়ায়, আর ছাত্রাবাসে, কুণ্ডলায়, সাজিনায়, গাছ যে কত লাগাল।

মাস্টার লাজুক ছেলে। দীপুকে বলে, কাগজে লিখেন? সাংবাদিক? দেখতে যাবেন আশ্রম।

—সাংবাদিক বন্ধু অনেক আছে।

পর্বত বলে, সব লিখে নিবে ছেলা। অঞ্চলে অভাব অনেক, কেউ লিখে না।

—অবশ্যই লিখে নেব।

সত্যেশ বলে, আমি লিখে দেব।

পচা বলে, কালকের কথা বল?

—কাল!

পর্বত দীপুকে বলে, বসে যাই নাই আমরা। তেঁতুলবেড়িয়ার বিল, পাবলিকের সম্পত্তি। আমরা কুমিরমারি চকভানপুর কুণ্ডলা, সজিনা, খয়েরপুর, তেঁতুলবেড়িয়া ছয় গ্রামের ঐক্য সমিতি ওই বিলের দখল, নোটিস জারি করে ফিরায়ে নিলাম। অনেক মিটিং, অনেক কথা। জেলেরাও আপিসের রেকর্ডে যে বিল সরকারের, তাতে পরেশের লোক দখল নেয় কেন? এখন পঞ্চায়েতও কারে পড়ি মানি নিছে।

—ঐক্য সমিতি কতদিনের?

—ছিল, আবার হল। এখন ঐক্যসমিতিতে বর্ণ হিন্দু-আদিবাসী-তপশীলী, ভেদাভেদ নাই কিছু। এ এক আশ্চর্য লাড়হাই। সরকারি অফিসার এবার পরথম এল। তারা বলে এ খুব ভালো। শুধু পার্টি আর পঞ্চায়েত! তারা পর্বতকে দেখে আর ভূত দেখে।

—বিলের দখল নিয়ে ?

—গাছ তো কাল বিলের পাশ ঘেরে লাগাব, আর মাইতি আছে, মিলেমিশে মাছের চাষ সমবায়ে···উত্তরে লধাপাড়া। তারা বিলের আইড়ে সবজিবাড়ি করতে পারে। আর সজিনা খালের পাড়ে পুরাতন শোঁসান···শোঁসানে ঘর তুলে না কেউ···গাছ লাগাব। ফরেস গাছ দিতেছে এখন।

—রাজনীতিক বাধা আসবে না ?

—সে সব তো থাকেই। লাড়হাই কি ফুরায় গো ছেলা ? লাড়হাইয়ের মুখ চ্যাহারা বদলায়। এই থে ছয় গ্রাম এক হই, এই যে লধা আদিবাসী বডিং, বহুত, বহুত লাড়হাইয়ের ফল্ল গো ! লধাদের দেখ ! চুরি না করলেও চোর ! না করলে, চুরি যে করায় সেও ধরা করাবে, থানাও ভাগ পায় না বলে ধরে পিটাবে। আজ হেথা লধার সঙ্গে ক্যারো বিবাদ নাই। বডিংয়ে লধা সুপার, লধা ছেলাও মাস্টার, লাড়হাই এটাও।

—কিছু গাছ, বিলের দখল···

—বাঁচতে হবেক নাই ? এবারে পঞ্চায়েত ঘেরব। আমাদের লামে দিল্লি হতে টাকা আসে সাগর সমান। ঘর করি দাও, পথ করি দাও, লয় আমায়দের টাকা আমারদের দাও, আমরা সব করি নিব।

—ওরা জানে না কিসে কিসে ওদের অধিকার।

—জানানো হয় না সত্যেশ দা।

—সেই কথা ছেলা। জানায় না, আর যা দেয় ছিটাছিটা, বলে পঞ্চায়েতের সজন্যে।

—"সৌজন্যে" পর্যন্ত।

—ওই হল। যাত্তারায় কৃষ্ণ সজন্য শাঁখ বাজাতেছিল না ? বল না গো।

—পাঞ্চজন্য শাঁখ।

—যাক গা! তা ছেলা, এখুন মাইতি কলকাতা হতে বই আনল, আমাদের বুঝাতেছে সব। চটি চটি বই, সে অ্যানেক বই।

অনন্ত খাটুয়া বলে, বইয়ে লিখে, দেয় না কিছু।

পর্বত বলে, লাড়হাই না করলে কে দিবে? তোমরাও বাবু! ইটা বুঝ না যি লাড়হাই বিনা কিছু মিলে না। হেই দেখ ছেলা! কিতাব লিখবে বুলে তো কত জনা এল। তারা বুলে, হাঁ পর্বত বাবু! আমারে "বাবু" বানায়। হাঁ পর্বত বাবু! ই তো আপনাদের ইটা উটা পাওয়ার লেগে দাবি! ইয়াতে রাজনীতি কুথা!

—বলতে পারে। ত্যাখন খুব লেচেছিলে যি!

—সি লাড়হাই এখুন কে করে? জানে কে? আমি বলি, বাবু! ইটা উটা মিলার লেগে কত লাড়হাই আমাদের…কত দিনের…কারে বুঝাই। ইটাও লাড়হাই। মানুষ নিজে বুঝে আগাচ্ছে, একটা একটা লেয্য দাবি মিলে কঠিন লাড়হাই করে, আর তাতে আমাদেরও মনে বিশ্বাসটো জাগে যি আমরা পারি!

সন্তোশ বলে, এও লাঙল দিয়ে ঢেলা ভেঙে কাদাতলা তৈরি দীপু।

—বুঝছি। বুঝতে চেষ্টা করছি।

—কাল গাছ লাগান্, কাজ অ্যানেক। তা পচা সিং ভূমিজ! কথাটি বল!

—কথা তো খাটুয়ারে।

—হাঁ অনন্ত বাবু। তুমরা জামাই কিনা ছাড়। আমাদের নাই, কিন্তুক দেখে দেখে সামাজে ঢুকতেছে। আমরা পারব নাই, মাণিকলাল মাঝি পারে। সি জনা ডাগদার। কিন্তু ক অত দিয়াথুয়া করলে গরিব পারবে কেনে?

অনন্ত বলে, পণ যতুক বিনা আজকাল…

—বন্ধ কর! তুমার জাতেও গরিব বেশি।

দীপু বলে, পণের কারণে ওদের সমাজেও?

মণ্ডল ঈষৎ হাসে।

—না দাদা, আমরা তেমন সভ্য হই নাই। বউ পুড়াতে এখুনো শিখি নাই।

সত্যেশ বলে, ওদের কন্যাপক্ষকে বরপক্ষ পণ দেয়। এসে., থাকো, ক্রমে দেখবে।

মঙ্গলী বলে, মিটিন ক্ষ্যামা দাও গো। জল আসে।

—মেঝান কি চা দিবে না?

রাজো, সনা, বাসো গেলাসে চা আনে। পর্বত বলে, এই কিছুকাল পচার ভাগ্‌না চায়ের দোকান দিছে সজিনায়। আমরা বড় কানা মানুষ গো ছেলা। আদিবাসী চা-সিগারেট-পান কিনে খাব, দোকান দিব না। এখন চক্ষু খুলতেছে।

মণ্ডল বলে, চক্ষু যখন খুলল, তখন দাঁড়াবার জায়গা নাই।

চা খেয়ে সভা ভাঙে।

সত্যেশ বলে, দীপু! আমি চলি।

পর্বত বলে, ভয় নাই গো মাইতি।

সন্ধ্যা না নামতে ঝিমঝিম নিঃশব্দ সব। রাতে পাকসাক হয় না ওদের। আজ হচ্ছে তপুর ভাইয়ের সম্মানে। একই কারণে রাজোমণি তার ঘর থেকে মুরগির ডিম দিয়েছে।

—খাওয়াদাওয়া এক সঙ্গে?

পর্বত বলে, চল দাওয়ায় বসি।

মঙ্গলী বলে; এই আন্‌ধারে?

—টরচ ব্যাটারি আছে।

—সাপের ভয় খুব?

পর্বত দার্শনিক উদারতায় বলে, তারা বা যাবে কুথা? বড় বড় মানুষরা আমাদের উচ্ছেদ করতেছে। আমরা ওরাদের উচ্ছেদ করতেছি,—ভয় নাই। মণ্ডল আছে।

মণ্ডল রাজোর ঘরে বসে হারিকেন জ্বেলে বাসোদের পড়া দেখে।

রাজো মুড়ি ও পেঁয়াজ দিয়ে যায় ও সহাস্যে বলে, আপুং গো! হুড়িং দাদা বলে, মেয়ে পড়াই, টাকা নিব।

মণ্ডল হেঁকে বলে, শুধা মুধার দিন আর নাই রে! তোর মেয়াদের মাথাও গবর।

বাসোরা হাসে। ওরা খুব হাসতে পারে।

পর্বত বলে, রাজো তো আমারই বিটি! যাবে বা কুথা! ঘাস বেচে, ঘুঁটা বেচে, মজুর খাটে। আর সনা তো ওরই ননদ। লবণ থাকলে···

—জানি।

—রাজো বিয়া করতে পারত। করল না।

—তাই তা দেখছি।

—বউও ওরাদের ছেড়ে থাকতে লারে। আর সনার কেন ছেলা হয় না···তুয়োজনে ডাগদারও দেখাল···সনার একটা বিটা বিটি যা হয় হলে···ই বড় তুঃখ হে ছেলা! মণ্ডলের পর ঘর ফাঁকা।

—কলকাতায় তো দেখায়নি।

—তাই পারি আমরা?

—একবার আসুক না। আমি দেখিয়ে দেব।

—সে তো ভালই হয়।

—দাদার কথা বলবেন না?

—ধান পাট করা বুঝ?

—না।

—ধান কাটার আগে পাট করব। তারপর লামব মাঠে, মেশিনের মতো কেটে যাব। তপুর কথা···মনে মনে পাট করি।

নিশ্বাস ফেলে পর্বত।

—বলব। তুমি তো সাঁজানে আসছ।

—হ্যাঁ···বহুকাল মনে মনে খুঁজছি।

দীপু ঈষৎ হাসে, কপালের চুল আঙুলে মোচড়ায়। পর্বত ওর

হাসিতে, ওর আঙুলের ভঙ্গিতে তপুকে দেখে, তা ও বুঝতে পারে না। ঈষৎ হেসে দীপু বলে, সোমদা, নবেন্দুদা, ওরাও মন ঠিক করতে পারছিল না। এখন যে কোনো লোক লিখছে দেখে ওরা মন ঠিক করল…বলল…

—ঘরে মা আছে ?

—আছেন।

—বাপ ?

—না…তার পরে পরেই…

মঙ্গলী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন ও সস্নেহে বলে, মারে নিয়ে আসবে এর পর।

—আসব। দিদি আছে।

—সবাইকে আনবে। পউষে এস গো।

পর্বত বলে, আশ্রমের ফানশানেই আসতে পারে।

—তাই আসব। একবার এলে কি হয় ?

—তারা তো যেতে আসে নাই, থাকতে আসছিল। ফিরল সবাই, শুধু তপু…

—পায়ে জখম ছিল ?

—জোর জখম। পাথর বিন্‌ল। আঙুল উলটাল…কিন্তুক ছেলা ! কালকের দিন যাক। তারপর।

—কাল অনেক কাজ ?

—অ্যানেক।

পর্বত ক্রমে দূরে চলে যায়।

—তখন ভাবি নাই আর করতে পারব কিছু ! জেহেল হল, বেরালাম। বাবুরা বলে, খ্যাড়কাটা কল লাও, জমি লাও, ছাইকেল লাও…আমি বলি, বাবু ! তাথে লবণটো নাকফুড়িটো বাঁচি উঠবে ? ঘরে আমি পরথমে পর্বত নাম, পাথরটো হই গিছিলাম।

—এখন তো খুব সক্রিয় ?

—মানুষ! মানুষ! এরা বলে, তুমি আছ, দেখ! ছেলারে স্কুলে লেয় না। লধারা বলে, তুমি থাকতে বাবুরা দোষে নির্দোষে থানায় লেয়। তারা বলে, একচেঞ্জেও জবর তু'নম্বরী হে! দেখ আসি আমাদের ছেলারা কাম পায় না। কে বলে, বিটিছেলাদের আধা মজুরি দেয়, তুমি আছ তো দেখবে লাই? ত্যাখন বুঝলাম…

—কি বুঝলেন?

—লাড়হাইয়ে মার খেলম, পুত্ত জামাই হারালাম, লাড়হাইয়ে মার খেলে ছেলা! বুক ভাঙি যায়, কত বছর পিছায়ে যাই, কি বাবা তিলকা মাঝির সময় হতে…

—হ্যাঁ, তাই হয়।

—সকালে হাত ধরি বউ বলে, যাও, নাহাও, ভাত পান্তা খাও! দেখ! বিটিছেলা উ! উয়ার বুকেও চিতা! উ এতদিন কত সহিছে. উ আমারে ই কথা বলে। তা সজিনা খালে নামি দেখি, জল বল, মাটি বল, কিছুই তো বদলায় নাই! আর মানুষ যখন আমারে "সেই পর্বত" বলি ডাকতে থাকল, ত্যাখন বুঝলম, কিছুই তো বদলায় নাই। ত্যাখন দিনে দিনে…

সত্যেশদা বলে, আপনি স্বভাব নেতা!

—মাইতির কথা!

মঙ্গলী বলে, চল গো! আন্ধার বাড়ে।

—ছেলা শুবে কোথা?

—তুমরা রাজোর ঘরে যাও। উরা হেথা থাকুক। না, কি বল?

—আজ হেথাই থাকুক। কাল বরং…

—তবে তুমরা থাক। আমি উদের ঘরে যাই। তুমি ভেব না গো ছেলা! এমন আমাদের হয়।

—দাদাও তো থাকত।

মঙ্গলী মাথা নাড়ে।

—গরুর গন্ধ ছাড়া তার ঘুম আসত না। আমানি ছাড়া তার মুখে লাগত না, আর খ্যাড় কুচাতে তার মতো আমিও পারি নাই। লবণের কাছে শিক্ষা, তা বাদে তীর চালাত দমাদম। ঘরের ছেলা তপু।

পর্বত বলে, চল চল, খাই।

খোরা শিঁড়িতে বসে কানা তোলা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, শাক, আলুপোড়া তেল পেঁয়াজে মেখে খাওয়া বড়ো মনে রাখার মতো। খাওয়ার পর দাওয়ায় দাঁড়াতে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক। সজিনা খালে জল বহে যায়।

এমন মায়াবী রাতে সব হতে পারে। খাল পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে চলে আসতে পারে নিখোঁজ মানুষ। বলতে পারে পর্বত আছ হে!

দীপু বিছানায় শুয়ে তাই ভাবে। সহসা ঘুমিয়েও পড়ে। পর্বত মশারি গুঁজে দেয় সযত্নে।

তারপর সকাল হয়।

ঝিরিঝিরি জল, দ্রিমি দ্রিমি মাদল ধম্‌সা।

বড় অবিস্মরণীয় মিছিল করে গান গেয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে তেঁতুলবেড়িয়ার বিলের পাশ ধরে আগের দিন কেটে রাখা গর্তে বাবলা, কাঁঠাল, জাম, শিরীষ, খিরিশ, পিয়াশাল, কেঁদ গাছের চারা লাগিয়ে চলা।

বালক বালিকারা শিশু চারা ঘিরে কাঁটাবাবলার ডাল কাটা বেড়া দেয়। গাছগুলি বাঁচাবার দায়িত্ব ওদের।

মিছিলটি এবার কুণ্ডলা ও সজিনা ঘুরে যায় প্রাচীন শ্মশানে।

সহসা থামে ধামসা মাদল।

পর্বত বলে, হেথা শোঁসান ছিল গো! বুড়াদের বলি না, অপরদের বলি। জমির কোনো দখলদারও নাই। আর

এখানেই লবণ···নাকফুড়ি···আগে পরে কতকজন···তা বন তো হবে নাই, গাছ হোক। গাছ হলে···আমরা বাঁচব···ছেলারা বাঁচবে···ইনি তপুর ভাই। আস ছেলা! পরথম গাছটি তুমি বসাও···চিন্ থাকি যাবে একটা।

দীপু নতজানু হয়, দু'হাতে নেয় শিশু চারা। চোখের জল বুঝতে দেয় না কি গাছ। মাটিতে হাঁটি গেড়ে সযত্নে ও গাছটি বসায়।

—সজজো সিং মুণ্ডা! তুমরা আস গো! মাইতি! মাস্টার! পচা সিং! নিবারণ ভক্তা কোথা? মাস্টার গো! এ সকল গাছ তোমার ছেলাদের হেফাজতী। আমিও একটা লাগাই, না কি, পচা?

—তু' সকল চারা লাগা।

—তু' গাছে গাছে বন করি দে।

—না না, ছেলা মেয়াদের ডাকো। উরা লাগাবে, লালবে, পালবে উরাও তো সব ভুলি যাবে গো সব! গাছ কি! তারে বাঁচালে সেও বাঁচায়, কিছু তো জানবে নাই।

মাস্টারটি এগিয়ে আসে। এখন সে নেতৃত্ব দেয় বালকদের। বলে, একদিকে "গাছ লাগান" অন্যদিকে গাছ চালান···এই, এই কানাই! শিকড় জানি হেলে না। উনি বুনা জাম গাছ। ক' বছরে বড় হবে, তোরা ওর উপর নাচবি তখন।

অনন্ত খাটুয়া বলে, ওঃ! ফটো উঠালে না দীপু? কাগজে বেরাত?

সত্যেশ বলে, আমি তুলে যাচ্ছি।

দীপু পর্বতের দিকে তাকায়। শ্মশানে গাছ লাগাবার পর এখনও পর্বতের আরো কাছে এসেছে।

সুজলা এগিয়ে আসে।

—আজ আর ভুল হবে না কার ভাই।

কৌতূহলী কানাই বলে, কার ভাই উনি?

লক্ষ্মণ মাস্টার বলে, কানাই রে! তুই কার ভাই?

—দাদার ভাই।

—উনিও তবে দাদা, দিদি, বোনের, ছোট ভাইয়ের ভাই! মাথায় ঢুকল? গাছে জল দে একটু।

গুণীজন অনন্ত এবং প্রখ্যাত কবিরাজ নিবারণ ভক্তা দুজনেই বলে, অগ্নীশ্বর তেঁতুলের চারা লাগাব হে এবার। দেখবে কেমন শোভা।

পর্বত বলে, তোমরাদের পুঁতে দেই, গাছ হয়ে বাড়ো। অগ্নীশ্বর তেঁতুল!

ধমসা মাদল বাজে, ঝিরিঝিরি বর্ষণ.

তপু

আজ রাতটি বড় জরুরি, বড় গুরুত্বপূর্ণ।

রাজোর ঘরে পর্বত ও তপু। দরজা খোলা। পর্বত বিছানায় বসে বিড়ি টানছে। দীপু নীরব।

—মেসিন চালাবে?

—আপনি যা বলেন।

—বলতে বড় কষ্ট হে। অনেক গোপনে রাখছি গো এতকাল! এই বুকের ভিতরে। আগে শুন।

—তাই হোক…

—জানি না, আমি জানি না…বলতে পারি যদি, মেসিনে ধরে নিলে বা ক্ষতি কি! কিন্তুক…

—এমনই বলুন।

পর্বত স্থির হয়। চোখ বোজে। চোখ খোলে।

—না…বলি আগে…তারপর দেখা যাবে…মেসিন সরাও।

টেপরেকর্ডার সরায় দীপু।

—এখন শুন।

—বলুন।

—বলি।

—সোম যা বলছে, সাচাই কথা! তখন ইখানে যুদ্ধ নামি গিছে। লবণ নাই, নাকফুড়ি নাই। পুলিশের হেফাজতে লাশ… লবণের মা, রাজোমনি কাঁদে, ঘরে থেকে মরল না, নিয়মে দাহ হল না, অস্থি ফেলালাম না, তেলনাহান হল নাই, ভদরী… বড় ছরাদ হল নাই…আমি তো এখান সেখান…রাতে আমি বললাম, এখুন তারাদের লেগে কানবি, না যারা আছে তারাদের কথা ভাববি?

—আপনি তখন কোথায়?

—নামে চকভানপুরে অনন্ত খাটুয়ার গরুমহিযের জাঙ্গালে কিন্তুক আমি তখন সর্বত্তর। আর…তপু…সে কোথা জান?

—আপনার গোহালে।

—যে রাতে সোম যায়, সে রাতে আমি, পচা, সাজো, আমরাই তো ওরাদের রেলে উঠলাম। সিধা পথ বন্ধ। ঘুরে ঘুরে…ঘুরে ঘুরে…কিন্তুক তার আগে ঘরে আসি নাই। জানি নাই যে তপু থাকি গিছে। সোমরে শুধালাম, সে কোথা?

—সোম বলে, সে তোমার ঘরে। গ্রাম ছাড়ি সে আসবে নাই। তোমার গোহালে। আমারে দেখলে পুলিশ লাশ ফেলাবে। আমার ঘরে পুলিশ হানা দেয়। আমার ঘরে তপু? আমি ঘরে ফিরব, তা টিশনের দূরেই আমি, পচা, সাজো তিন ভাগ হই খাব, দেখি কাদের জীপ।

—তখন?

—মাথায় গামছা বাঁধি, যেমন খুব মাতাল, এমনে গান করতে করতে খানিক আসি দৌড়ালাম খুব। পথ ঘাট তো নাই। শুধা জঙ্গল, ঝোপ, আর মাঝে মাঝে জমিনের আইড়া। তাই ধরি

দৌড়াই। পচা বলে, ঘর যাস না। আমি বলি, তুরা পলা। নিবারণ ভক্তার ঘরে ওরাদের ঢুকায়ে আমি ঘরে আসি পড়লাম।

—দাদা তখনো গোহালে?

—না। পিছনে, বাবলা বনে। আমি বলি, ই কি করলা তুমি? থাকি গেলে? জখমের লাগি?

—খুব জখম?

—জোর জখম।

—সে কি বলল?

—বলল, কমরেট! গ্রামের লাড়হাই তোমরাই করছ, কিন্তুক আমরাও তো আসি গিছিলাম। পাইপগান লয়ে লাড়হাই, বন্দুক ছিনতাই···

—আমি বললম, কিন্তুক! এখুন তোমারদের শহরে ফিরি যাবার কথা! উ বলল, গ্রামে জুলুম নামতেছে, গ্রাম আমি ছাড়ব নাই। আর পায়ে যা জখম! পলানোও শক্ত। আর কমরেট! পরেশটারে না মারলে আমার শান্তি নাই। তুমি আর মণ্ডল পলায়ে থাকো। আমি মেঝানদেরে পাহারা দিব।

—আমি বলি, থাকবে কুথা? তপু বলে তাও দেখে রাখছি, তুমার চিন্তা নাই।

—কোথায় থাকল?

—চলো, দেখাই।

টর্চ নিয়ে বাইরে আসে। ওরা উঠোনে টর্চ ফেলে ফেলে এগোয়।

পর্বতকে ক্রমেই অচেনা মনে হচ্ছে দীপুর। ও কি আয়তনে আকারে বেড়ে যাচ্ছে?

—হোই তেঁতুল গাছটা।

হ্যাঁ। সোমের বর্ণিত সেই আদিম, অফলা, অতিকায় অত্যন্ত জটিল ডালপালায়, ঘন পাতায়, সেই তেঁতুল গাছ। অন্ধকারে মনে

হয় অন্ধকারে তৈরি কোনো অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষ হাত ছড়িয়ে ঝুঁকে সজিনা খালের কথা শুনছে গভীর মনোযোগে।

—উয়ার উপরে ডালপালায় খড় ফেলি থাকি গেল। পাইপগান ছিল। ছিটা ছিল কি না জানি না। টাঙ্গি ছিল। উখানে উঠি থাকি গেল।

—কতদিন?

—হিসাব নাই। বারো পনেরো দিন তো হবে। অনেক রাতে রাজো বাঁশে বাঁধি মুড়ির-টোপলা, জলের প্যাঁচঘটি উঠায়ে দিত। উখানে বসে বলত, ডরে না মেঝেন। পুলিশ বেইজ্জতি করে তো আমি একটারে মেরে মরব।

—মণ্ডলের মা কি বলতেন?

—সেও ত্যাখন পাগল! বলত, লবণ লুকায়ে থাকলে যা করতাম তাই করব। পুলিশ আসলে বলত, স—ব তল্লাস কর। না করলে কাটি ফেলাব।

—সার্চ করল?

—করল? রোজ ভাবতাম কখন শুনব কি, গাছে খোঁচা মারি ওরে ধরছে।

—তা তো করেনি?

—না। করে নাই। সি সময়ে নিবারণ ভক্তা…না, সি লাড়হাইয়ে নামে নাই যেমুন, অষুদপালা দিয়া কতজনরে উপকার করছে। থানা ভাবেও নাই কুনো লধা এমুন সময়ে সাহস করতে পারে।

—অষুদ পালা? পায়ের জন্য?

—হাঁ…জখম পচ ধরি যেত, মুথা ঘাস আর ঘি বাটার লেপ, রসুন ঘিয়ের লেপ, বাবলা ছাল সিজাই তার লেপ, ই সবে কতক ঠেকান গিছিল…কিন্তুক পেনিচিলিন নাই…আহার নাই…হগা মুতা চাপি রাখি রাত আন্ধারে লামত…কিন্তুক ঘা দেখি লবণের

মা ডরাত, উয়ার মুখে শব্দ নাই। ভাবি, কেমুন করি অত সহি গেল!

—ভাবতে পারি না।

এই গাছে, খড়ের উপর বসে থাকা, গামছায় নিজেকে বেঁধে রাখা, যমযন্ত্রণা সহে বোবা হয়ে থাকা...

পর্বত তেঁতুল গাছের সামনে দাঁড়ায়। সজিনা খালের দিকে চেয়ে থাকে।

—একদিন লবণের মা কেন্দে কেটে মাইতির বউরে বলল, ফার্সা নেকড়া দাও বউ। আমার তো নাই। তা সি সময়ে ফার্সা কাপড় আনল...অমি আসি তুই তিন দিনে...আমারে বলল, কিছু কি ঠাণ্ডা পড়ে নাই? তপুরে গেঃ আর রাখা যায় না।

—আমি বলি কেন?

—বউ বলে, ঘায়ে গন্ধ উঠি গিছে। ততদিনে আমার গোহালের চালা কাটি ফেলাছে পুলিশ, ঘরেও চালা নাই বললে হয়, ঘরে কিছু নাই...বউ, সনা, রাজো আর মেয়ে তুটা। বাসোটা বৎসর দেড়েক। ছোটটা গেঁদা। আমি পারলে কিছু চাল আনি। নয় তো ওরা কান্দা মূল কি খায়। ত্যাখন বাঁচাছে খাটুয়া। বাঁচাছে বেরার ভাতুয়া রাবণ। যা দেয় তাই ভাল।

—তারপর?

—আমি পরেশের খবর রাখি, তপুরে দেই। তা সেদিন রাতে রাজো বলে, চালার ওধারে যাও।

—দাদা নেমে এসেছিল?

—আসছিল। পা দেখি ডরে গেলাম। গা জ্বরে পুড়ি যায়। বলল, পর্বত! কমরেট! আমি তো লবণদের কাছে যেতেছি। আর সাবোধান হব লাই। তুমি পলায়ে থাক হে! আর যদি পার! আমার লাহাশটো যেমন পুলিশ না পায়, ই কথাটো দাও। আর...কেউ যেমুন না জানে।

—কথা…দিয়েছিলেন ?

পর্বত হাসে।

—দিবে না ?

বুকে চাপড় মেরে বলে, পর্বত সানতাল কথা দিবে না ? তার শ্বাসে গন্ধ, চুল দাড়ি জটা পড়া, উয়ারা তো বিশ বলেছিল, বলে নাই ? যি বিশ বোলে, তারে কুনো সানতাল বেইমানি করতে পারে ?

—তারপর ?

দাদা কাছে, খুব কাছে। ষোল বছরের ওপার থেকে দাদা ওর গায়ে হাত রাখছে। জ্বরতপ্ত আঙ্গুল কি জরুরি খবর জানায় দীপুকে গায়ে হাত বুলিয়ে ?

—বউরে বলল, ভাত দিবি মেঝান ? বউ বলল দিব। আধা পালি চাল মাটিতে পুঁতা ছিল। তাই রাঁধি একমুষ্টি ! খেতে পারল নাই। চক্ষু ঘোলা ত্যাখন।

—তারপর ?

—আমারে তো পলাতেই হল। আমি পলালাম। তখন আমি কখন সাপ, কখন শিয়াল। চলো ছেলা, হাঁট। ই আমার অষুদপালার বাড়ি। ঈশেরমূলে ঝাড় বাঁধি গিছে, কিষ্টতুলোসি ঝাড় বাঁধি গিছে, সাপ ডর নাই।

সম্মোহিত দীপু ওর সঙ্গে চলে। টর্চের তীব্র আলোয় গাছগুলি বড়ো অশরীরী, বড়ো মায়াময়। তীব্র গন্ধও বটে।

—তারপর ?

—তারপর…তারপর…কেনে ? পরেশ কাটা পড়ল তারপর ?

—দাদা !

—বউ আর রাজো তারে সাজিনা পারায়ে দিছিল। কুন শক্তিতে সি ছেঁছুড়ি যায়, কুন শক্তিতে পরেশরে কাটে, কুন শক্তিতে ছেঁছুড়ি বুকে হাঁটি, ধানের মুঠ ধরি ধরি বুকে হাঁটি আবার ফিরে, আমি জানি না।

—তখন তো সকাল !

—হাঁ…সকাল…কোয়াশা…সজিনায় নামি খুঁটা ধরি পড়ি যায়। বউ আর রাজো সাবোধান ভুলি তারে টানি গোহালের চালায় ফেলে, চালার খড়েই চাপা দেয়।

—চাপা দেয় !

—পায়ে পচ ধরি ফুলা যেমন কলাগাছ ! বুকের ধকধকি এই আছে এই নাই। বউরে বলছিল, কমরেট ! বউ জল দেয়। জল যায় নাই।

—তার…পর…?

—পুলিশ…তালাস…কিন্তুক পুলিশ মরি গেল বালিমারিতে তাতেই সেদিন আসে নাই সকালে।

—দাদা…দাদার কি হল ?

—পর্বত রাতে আসি গেল।

—তারপর ?

—পর্বত রাতে আসি গেল।

—দাদা ?

—হোই গাছ দেখ।

টর্চের বাতিতে অর্জুন গাছটির সাদাটে কাণ্ড। জড়িয়ে উঠে ছড়িয়ে গেছে হাড়ভাঙা লতা।

—ওটা তো অর্জুন গাছ।

—সাবোধান ছেলা ! উয়ার নিচে তোমার দাদা আছে। গাছটো তপু হয় হে ! অর্জুন বড়ো পুণ্য গাছ। ছালে বাকলে অষুদ দেয় মানুষরে।

—ওইখানে !

—হাঁ। আমি সাবোধান হারাই নাই। রাতেই তারে আমি আর বউ ঘাসের চাপড়া দিয়া ঢাকি দিলাম মাটি…

—ওইখানে !

পর্বত ওর হাত চেপে ধরে।

—এখুন ?

—কি ?

—ই কথা পরকাশ করবে ভাব ? ষোল বৎসর কেউ জানল না···বউ, রাজো, সনা, আমি···কিন্তুক মাটি ধরি তারে শপথ করা আছে, কেউ জানবে না। আমরা কথাটা রাখছি। তুমি কি করবে ? ই শপথ তুমা হতে পরকাশ হবে! বিশ বোলো, বিশ বোলো ছেলা··· · আজো সি একজনা, যার কথা মানুষ জানে না, আন্দাজ করে যদি বা, পর্বতরে কেউ শুধাবার সাহস লাই হে! তোমা হতে পরকাশ হলে...

—কি করবেন ?

—কাটি দিব।

পর্বত হাসে নিঃশব্দে। তারপর বলে,—

—পর্বতের হাত কিছু লাশ ফেলাছে সি সময়ে, তুমারে মারতে কি বা!

—তপুর ভাইকে কাটবেন ?

—রক্তে ভাই হয় না হে ছেলা।

দীপু বলে, হাত নামান।

পর্বত হাত নামায়।

দীপু ওর চোখের দিকে তাকায়। এখন ও আর তপু খুব কাছাকাছি। এরাই তপুর কাছে তপুর পরিবারের চেয়ে অনেক সত্যি ছিল। অনেক। এদের জন্তেই সে এসেছিল। এরাই তাকে চিনেছিল, ভালবেসেছিল।

মাটির সঙ্গে সে মাটি হয়ে গেছে।

কিন্তু গ্রাম ছেড়ে যায়নি বলে, "মেঝানকে পাহারা দিব" বলেছিল বলে, পরেশকে মেরেছিল বলে, তপুকে তিনটি রমনী ও একটি পুরুষ ষোলবছর অস্থি পঞ্জরে রক্ষা করছে শপথের মতো।

সে থাকুক নিখোঁজ, এক রহস্য, এক জিজ্ঞাসা হয়ে ওদের বুকের কোটরে। ওরা যেদিন থাকবে না, অর্জুন গাছটা থাকবে।

দীপু আস্তে বলে, কোনোদিন বলব না। কেউ জানবে না। সে, সে তো আপনাদের। লবণের মতো। নাকফুড়ির মতো তাই না?

—ছেলা বিশ বোল্।

—বিশ!

—বিশ বোল্।

—বিশ।

—বিশ বোল্।

—বিশ · বিশ·· বিশ···

দীপু পর্বতকে জড়িয়ে ধরে, পর্বতের বিশাল বুকে মুখ ঘষে দীপু কাঁদে।

এখানে দাঁড়িয়ে সকল সততায় বিশ না বললে দীপু কেমন করে পৌঁছবে একুশ শতকে? অঙ্কের হিসেবে আজ থেকে পনের বছর বাদে নতুন শতকে পৌঁছলেই তো তা যথার্থ উত্তরণ হবে না।

তপু বড়ো কাছে, ওদের সঙ্গ এখন।

পর্বত ওকে কাঁদতে দেয়।

অর্জুন গাছটি মেঘভাঙা আকাশের তারার আলোয় বড়ো স্নেহে চেয়ে দেখে ওদের।

পর্বত দীপুর পিঠে হাত বুলায়। কিছু বলে না। বলবার কিছু নাই হে ছেলা। লাড়হাইটো ছাড়লে চলে না। সকল কথা একবারে হবে নাই। বার বার এসো, জানো।

—বাঁচাটা লিয়েই তো সকল কথা গো!

অর্জুন গাছ সাক্ষী হয়ে থাকে। গাছটি যেন পত্রমর্মরে বলে, আমি সাক্ষী, আমি সাক্ষী দীপু, তুই বিশ বলেছিস।

সমাপ্ত